রসকলি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

pdfpustak.com

রসকলি

উৎসর্গ

কবিগুরু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু

২৫শে বৈশাখ
১৩৪৫

কালাপাহাড়

সংসারে অবুঝকে বুঝাইতে যাওয়ার তুল্য বিরক্তিকর আর কিছু নাই। বয়স্ক অবুঝ শিশুর চেয়ে অনেক বেশি বিপত্তিকর। শিশু চাঁদ চাহিলে তাহাকে চাঁদের পরিবর্তে মিষ্টান্ন দিলে সে শান্ত হয়, তাহা না হইলে প্রহার করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়া শান্ত হয়। কিন্তু বয়স্ক অবুঝ কিছুতেই বুঝিতে চায় না, এবং ভবীর মতো ভুলিতেও চায় না।

যশোদানন্দন বহু যুক্তিতর্ক দিয়াও বাপকে বুঝাইতে পারিল না, অবশেষে যাহাকে বলে তিক্ত-বিরক্ত, তাই হইয়া সে বলিল, তবে তুমি যা মন তাই কর গে যাও, দুটো হাতি কিনে আন গে।

কল্পিত হাতি দুইটা বোধ করি শুঁড় ঝাড়িয়া রংলালের গায়ে জল ছিটাইয়া দিল, রংলাল রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। সে হুঁকা টানিতেছিল, কথাটা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত ছেলের মুখের দিতে চাহিয়া রহিল। তারপর অকস্মাৎ হাতের হুঁকাটা সজোরে মাটির উপর আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া বলিল, এই নে।

যশোদা অবাক হইয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রংলাল বলিল, হাতি—হাতি। বলি, ওরে হারামজাদা, কখন আমি হাতি কিনব বলেছি ?

যশোদা এ কথারও কোন জবাব দিল না, সেও রাগে ফুলিতেছিল। গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

রংলাল এতক্ষণে বোধ হয় 'হাতি কেনা' কথাটার একটা জবাব খুঁজিয়া পাইয়াছিল—সেও এবার শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, হাতি কেন ? দুটো ছাগল কিনবি বরং, ফলাও চাষ হবে। বাঁশের ঝাড়ের মত ধানের ঝাড় হবে, তিন হাত লম্বা শীষ! চাষার ছেলে নেকাপড়া শিখলে এমনিই মুখ্যুই হয় কিনা! বলি, হাঁ রে মুখ্যু, ভালো গোরু না হলে চাষ হয় ? লাঙল মাটিতে ঢুকবে এক হাত করে, এক হেঁটো মাটি হবে গদ্‌গদে মোলাম ময়দার মতো, তবে তো ধান হবে, ফসল হবে।

রংলাল ধরিয়াছে এবার সে গোরু কিনিবে। এই গোরু কেনার ব্যাপার লইয়া মতদ্বৈধহেতু পিতা-পুত্রে কয়েকদিন হইতেই কথা কাটাকাটি চলিতেছে। রংলাল বেশ বড় চাষী, তাহার জোতজমাও মোটা, জমিগুলিও প্রথম শ্রেণীর। চাষের উপর যত্ন অপরিসীম। বলশালী প্রকাণ্ড যেমন তাহার দেহ, চাষের কাজে খাটেও সে তেমনই

অসুরের মত—কার্পণ্য করিয়া একবিন্দু শক্তিও সে কখন অবশিষ্ট রাখে না। বোধ হয়, এই কারণেই গোরুর উপরেও তাহার প্রচণ্ড শখ! তাহার গোরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর,—কাঁচা বয়স, বাহারে রং, সুগঠিত শিং, সাপের মত লেজ এবং আরও অনেক কিছু গুণ না থাকিলে গোরু তাহার পছন্দ হয় না। আরও একটা কথা—এ চাকলার মধ্যে তাহার গোরুর মত গোরু যেন আর কাহারও না থাকে। গোরুর গলায় সে ঘুঙুর ও ঘণ্টার মালা ঝুলাইয়া দেয়, দুইটি বেলা ছেঁড়া চট দিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গ ঝাড়িয়া মুছিয়া দেয়, শিং দুইটিতে তেল মাখায়; সময়ে সময়ে তাহাদের পদসেবাও করে, কোন দিন পরিশ্রম বেশি হইলে তাহাদের পা টিপিতে টিপিতে বলে, আহা কেষ্টর জীব?

গত কয়েক বৎসর অজন্মার জন্য এবং পুত্র যশোদাকে স্কুলে পড়াইবার খরচ বহন করিতে হওয়ায় রংলালের অবস্থা ইদানীং একটু অসচ্ছল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যশোদা এবার ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে, আর গতবার ধানও মন্দ হয় নাই; এই জন্য এবার রংলাল ধরিয়া বসিয়াছে, ভালো গোরু তাহার চাই-ই। একজোড়া গোরু গতবার মাত্র কেনা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রতি রংলালের মমতা নাই। গরু দুইটি ছোটও নয় এবং মন্দও কোনোমতে বলা চলে না; কিন্তু এ অঞ্চলে তাহাদের চেয়ে ভালো গোরু অনেকের আছে।

যশোদা বলিতেছে, এ বৎসরটা ওতেই চলুক, আমি চাকরি-বাকরি একটা কিছু করি; আর এবারও যদি ধান ভালো হয় তবে কিনো এখন আসছে বছর। কিনতে গেলে দুশো টাকার কম তো হবেই না, সে টাকা তুমি এখন পাবে কোথা?

টাকা কোথা হইতে আসিবে—সে রংলাল জানে না, তবু গোরু তাহার চাই-ই।

অবশেষে রংলালের জিদই বজায় থাকিল। যশোদা রাগ করিয়াই আর কোন আপত্তি করিল না। টাকাও যোগাড় হইয়া গেল। যে গোরু-জোড়াটা তাহার ছিল সে জোড়াটা বেচিয়া হইল এক শত টাকা, বাকি একশত টাকার সংস্থান করিয়া দিল যশোদার মা। সে রংলালকে গোপনে বলিল, ওর সঙ্গে ঝগড়া করে কি হবে? তুমি গোরু কিনে আন না! কিনে আনলে তো কিছু বলতে নারবে।

রংলাল খুশি হইয়া বলিল, বেশ বলেছ, তাই করি। তারপর উ আপনার মাথা ঠুকুক কেনে?

যশোদার মা বলিল, এ গোরু দুটো বেচে দাও, আর এই নাও—এইগুলো বন্ধক দিয়ে গোরু কেনো তুমি। ভালো গোরু নইলে গোয়াল মানায়?

সে আপনার গয়না কয়খানি রংলালের হাতে তুলিয়া দিল। রংলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

যাক, রংলাল টাকা-কড়ি সংগ্রহ করিয়া পাঁচুন্দি গ্রামের গোরু-মহিষের বাজারে যাইবার সংকল্প করিল। বাছিয়া বাছিয়া মনের মতো দুইটি গোরু সংগ্রহ করিবে। হয় দুধের মতো সাদা, নয় দধিমুখো কালো দুইটি। পাঁচুন্দির হাটে প্রবেশ-মুখেই সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। হ-হ! এ যে— ওরে বাস রে—এ যে হাজার হাজার রে বাবা!

হাজার হাজার না হইলে গোরু-মহিষ দুই মিলিয়া হাজারখানেক আমদানি পাঁচুন্দির হাটে হয়। আর মানুষ তেমনই অনুপাতে জুটিয়াছে। গোরু-মহিষের চীৎকারে মানুষের কলরবে—সে অদ্ভুত কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে। মাথার উপর সূর্য তখন মধ্যাকাশে। যেখানটায় জানোয়ার কেনা-বেচা হইতেছে, সেখানে এক ফোঁটা ছায়া কোথাও নাই। মানুষের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, তাহারা অক্লান্তভাবে ঘুরিতেছে। রংলাল সেই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

গোরুগুলি এক জায়গায় গায়ে গায়ে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখে চকিত দৃষ্টি। পাইকারগুলো চীৎকার করিতেছে ফেরিওয়ালার মতো—এই যায়! এই গেল! বাঘবাচ্চা! আরবী ঘোড়া!

রংলাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আপনার মনের মতো সামগ্রীর সন্ধান করিতেছিল।

ওদিকটায় গোলমাল উঠিতেছে প্রচণ্ডতর। কান পাতা যায় না। মনে হয় যেন দাঙ্গা বাধিয়াছে। রংলাল ওই দিকটার পানেই চলিল। এ দিকটায় মহিষের বাজার। কালো কালো দুর্দান্ত জানোয়ারগুলাকে অবিরাম ছুটাইয়া বেড়াইতেছে। পাইকারদের দল চীৎকার করিয়া বড় বড় বাঁশের লাঠি দিয়া অবিশ্রান্ত পিটিতেছে, আর জানোয়ার-গুলা ছুটিয়া বেড়াইতেছে জ্ঞানশূন্যের মতো। কতকগুলা একটা পুকুরের জলে পড়িয়া আছে। নেহাত কচি বাচ্চা হইতে বুড়া মহিষ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য আনিয়াছে। কতক-গুলার গায়ের চামড়া উঠিয়া গিয়া রাঙা ঘা থকথক করিতেছে। আরও একটু দূরে আমগাছ-ঘেরা একটা পুকুরের পাড়েও লোকের ভিড়। রংলাল সেখানে কী আছে দেখিবার জন্য চলিল। একটা পাইকার মহিষ তাড়াইয়া আনিতেছিল, সহসা তাহার আস্ফালিত লাঠিগাছটা হাত হইতে খসিয়া রংলালের কাছেই আসিয়া পড়িল। রংলালের একটু রাগ হইল, সে লাঠিগাছটা তুলিয়া লইল।

পাইকারটার অবসর নাই, সে অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া বলিল, দাও দাও, লাঠিগাছটা দাও হে!

যদি আমার গায়ে লাগত!

তা তুমার লাগত না হয় খানিক টুকচা রক্ত পড়ত, আর কী হত?

রংলাল অবাক হইয়া গেল, রক্ত পড়ত আর কী হত?

দাও দাও ভাই, দিয়ে দাও। হাত ফসকে হয়ে গেইছে, দাও দাও!

রংলালকে ভালো করিয়া দেখিয়া এবার পাইকারটি বিনয় প্রকাশ করিল।

লাঠিগাছটা দিতে গিয়া রংলাল শিহরিয়া উঠিল, এ কী, লাঠির প্রান্তে যে সুচের অগ্রভাগ বাহির হইয়া রহিয়াছে!

পাইকারটা হাসিয়া বলিল, উ আর দেখে কাজ নাই, দিয়ে দাও ভাই!

রংলাল বেশ করিয়া দেখিল—সুচের অগ্রভাগই বটে; একটা নয়, দুই-তিনটা। হঠাৎ একটা শোনা-কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—পাইকারেরা লাঠির ডগায় সুচ বসাইয়া রাখে, ওই সুচের খোঁচা খাইয়াই মহিষগুলা এমন জ্ঞানশূন্যের মতো ছুটিয়া বেড়ায়। উঃ!

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, পাইকারটা বলিল, কী, কিনবে কী কর্তা? মহিষ কিনবে তো লাও, ভালো মহিষ দিব, সস্তা দিব—অ্যাই—অ্যাই! বলিয়া রংলালকে দেখাইয়াই সে মহিষগুলাকে ছুটাইতে আরম্ভ করিল।

বাপ রে, বাপ রে, বলিহারি বাপ রে আমার!—মধ্যে মধ্যে আবার আদরও সে করিতেছে।

রংলাল আসিয়া উঠিল বাগানে।

চারি পাশেই মহিষের মেলা; এগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর অযথা তাড়নার ফলে ছুটিয়াও বেড়াইতেছে না। শান্তভাবে কোনটি বসিয়া, কোনটি দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া বুজিয়া রোমন্থন করিতেছে।

গোরু এ বাগানে নাই। রংলাল সেখান হইতে ফিরিল, কিন্তু একেবারে বাগানের শেষ প্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—এ কি মহিষ, না হাতি? এত প্রকাণ্ড বিপুলকায় মহিষ রংলাল কখনও দেখে নাই। কয়জন লোকও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। একজন বলিতেছিল, এ মোষ কে লেবে বাবা?

পাইকারটা বলিল, এক লেবে ভাই রাজায় জমিদারে, আর লেবে যার লক্ষ্মী নাই সেই। ঘুরছি তো পাঁচ-সাত হাট; দেখি আবার কোথাও যাব।

অন্য একজন বলিল, এ মোষ গেরস্ততে নিয়ে কী করবে? এর হালের মুঠো ধরবে কে? তার জন্যে এখন লোক খোঁজ!

পাইকার বলিল, আরে ভাই, বুদ্ধিতে মানুষ বাঘ বশ করছে, আর এ তো মোষ। লাঙল বড় করলেই জানোয়ার জব্দ! এর লাঙল মাটিতে ঢুকবে দেড় হাত।

রংলাল তীক্ষ্ণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে মহিষজোড়াটার দিকে চাহিয়া ছিল—বলিহারি, বলিহারি! দেহের অনুপাতে পাগুলি খাটো, আবক্ষ পঙ্ক হইতে অন্তত বিশ মণ ওজন তো স্বচ্ছন্দে ওই খাটো পায়ে খুঁটি দিয়া তুলিয়া লইবে! কী কালো রং! নিকষের মতো কালো। শিঙ দুইটির বাহার সবচেয়ে বেশি, আর দুইটিই কি এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছে—যেন যমজ শিশু!

কিন্তু দামে কি সে পারিবে ? আচ্ছা, দেখাই যাক, হাট ভাঙিয়া শেষ লোকটি পর্যন্ত চলিয়া যাক, তখন দেখা যাইবে, পাইকারটাও তো বলিল, পাঁচ-সাতটা হাটে কেহ খরিদ্দার জুটে নাই। কথা তো শুধু টাকাই নয়, সকলের চেয়ে বড় কথা, ওই জানোয়ার দুইটির দুইটি বিপুল উদর।

রংলাল ওই মহিষ দুইটাই কিনিয়া ফেলিল, কিছুতেই সে প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না। ঐ টাকাতেই তাহার হইল ; পাইকারটাও কয়েকটা হাট ঘুরিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকগুলি টাকা তাহার এত দিনে আবদ্ধ হইয়া আছে। সে যখন দেখিল, সত্যই রংলালের আর সম্বল নাই, তখন একশত আটানব্বুই টাকাতেই মহিষ দুইটি রংলালকে দিয়া দিল। রংলালের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কল্পনানেত্রে দেশের লোকের সপ্রশংস বিস্ফারিত দৃষ্টি যেন প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিল। কিন্তু যত সে বাড়ির নিকটবর্তী হইল, ততই তাহার উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া অবসাদ প্রবল হইয়া উঠিল। লেখাপড়া-জানা ছেলেকে তাহার বড় ভয়। তাহার কথাবার্তার জবাব দিতে রংলালের হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। তা ছাড়া, এত বড় দুইটা জানোয়ারের উদর পূর্ণ করা তো সহজ নয়! এক-একটাতেই দৈনিক এক পোণেরও বেশি খড় নস্যের মতো উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে।

গিন্নী—যশোদার মা—কী বলিবে ? মহিষের নাম শুনিলে জ্বলিয়া যায়। রংলাল মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে এক-এক সময় বিদ্রোহ করিয়া উঠে। কেন, কিসের ভয়, কাহাকেই বা ভয় ? ঘরই বা কাহার ? সম্পত্তির মালিকই বা কে ? কাহার কথার অপেক্ষা করে সে ? চাষ কেমন হইবে সে কথা কেহ জানে ? রংলালের মনে হইল—মাটির নীচে ঘুমন্ত লক্ষ্মীর যেন ঘুম ভাঙিতেছে—মাটির নীরন্ধ্র আস্তরণ লাঙলের টানে চৌচির করিয়া দিলেই মা ঝাপিখানি কাঁখে করিয়া পৃথিবী আলো করিয়া আসন পাতিয়া বসিবেন। এক হাঁটু দলদলে কাদা, কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ! ধানের চারা তিন দিনে তিন মূর্তি ধরিয়া বাড়িয়া উঠিবে।

কিন্তু এ ভাবটুকুও তাহার স্থায়ী হয় না, সে আবার ছেলে ও স্ত্রীর মুখ মনে করিয়া স্তিমিত হইয়া পড়ে। মনে মনে সে তাহাদের তুষ্টিসাধনের জন্য তোষামোদ-বাক্য রচনা আরম্ভ করিল।

বাড়িতে আসিয়াই সে যশোদাকে হাসিতে হাসিতে বলিল, হাতিই এক জোড়া কেনলাম, তোর কথাই থাকল।

যশোদা মনে করিল, বাবা বোধ হয় প্রকাণ্ড উঁচু একজোড়া বলদ কিনিয়াছে। সে বলিল, বেশি বড় গোরু ভালো নয় বাপু! বেশ শক্ত শক্ত গিঁঠ-গিঁঠ গড়ন হবে, উঁচুতেও খুব বড় না হয়—সেই তো ভালো।

একমুখ হাসিয়া রংলাল বলিল, গোরুই কিনি নাই আমি, মোষ কিনলাম।

যশোদা সবিস্ময়ে বলিল, মোষ?

হ্যাঁ।

আর এমন করে হেসো না বাপু তুমি, আমার গা জ্বলে যাচ্ছে—যশোদার মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

আহা হা, আগে তাই চোখেই একবার দেখ, দেখেই যা হয় বল। লাও লাও, জলের ঘটি লাও, হলুদ লাও, তেল লাও, সিঁদুর লাও—চল দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢুকাও তো!

দেখিয়া শুনিয়া যশোদার মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল, সে বলিল, নাও, এইবার চালের খড় ক গোছাও টেনে নিয়ে দিও শেষে। ও কি সোজা পেট। এক-একটির কুম্ভকর্ণের মতো খোরাক চাই। যুগিও কোথা হতে যোগাবে!

যশোদার মা অবাক হইয়া মহিষ দুইটাকে দেখিতেছিল, হোক ভয়ঙ্কর, তবুও একটা রূপ আছে—যাহার আকর্ষণে মানুষকে চাহিয়া দেখিতে হয়। মহিষ দুইটা ঈষৎ মাথা নামাইয়া তির্যক ভঙ্গীতে সকলকে চাহিয়া দেখিতেছিল। চোখের কালো অংশের নীচে রক্তাভ সাদা ক্ষেত্র খানিকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।—ভীষণ রূপের উপযুক্ত দৃষ্টি।

রংলাল বলিল, দাও, পায়ে জল দাও।

বাবা রে! ওদের কাছে আমি যেতে পারব না।

না না না। এস তুমি, কাছে এস, কোন ভয় নাই, চলে এস তুমি। ভারি ঠাণ্ডা!

যশোদার মা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আগাইয়া আসে। মহিষ দুইটি ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কিছু বোধ করি বলিতে চাহে। রংলাল বলিল, অ্যাই খবরদার! মা হয় তোদের, ফেন দেবে, ভাত দেবে, ভুষি দেবে। বাড়ির গিন্নী, চিনে রাখ!

তবুও যশোদার মা সরিয়া আসিয়া বলিল, না বাপু, এই তেল সিঁদুর হলুদ তুমি দিয়ে দাও, ও আমি পারব না। যে কালাপাহাড়ের মতো চেহারা!

রংলাল বলিয়া উঠিল, বেশ বলেছ। একটার নাম থাকুক কালাপাহাড়।—এইটা, এইটাই বেশি মোটা, এইটাই হল কালাপাহাড়। আর এইটার নাম কী হবে বল দেখি?

একটু চিন্তা করিয়াই সে আবার বলিল, আর একটার নাম কুম্ভকর্ণ—যশোদা বলেছে। বেশ বলেছে!

যশোদার মাও খুশি হইয়া উঠিল, কিন্তু যশোদা খুশি হইল না।

রংলাল বিরক্ত হইয়া বলিল, গোমড়া মুখ আমি দেখতে লারি।—সে গুরুই হোক আর গোঁসাই হোক।

রংলাল কালাপাহাড়ের পিঠে চড়িয়া কুম্ভকর্ণকে তাড়া দিতে দিতে তাহাদের নদীর ধারে চরাইতে লইয়া যায় সকালেই, ফেরে বেলা তিনটায়। শুধু যে এটা খড় বাঁচাইবার জন্যই সে করে তা নয়; এটা তাহাকে নেশার মতো পাইয়া বসিয়াছে। বাড়ির সমস্ত লোক ইহার জন্য বিরক্ত, এমন কি, যশোদার মা পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রংলাল হাসিয়া বলে, এবার খড় কত টাকার বেচি তা দেখ। খড় বেচেই এবার একখানা গয়না তোমার হবে।

যশোদার মা বলে, গয়নার জন্যে আমার ঘুম হয় না, না তোমাকে দিনরাত আগুনের ছেঁকা দি, বল তো তুমি ?

যশোদা বলে, যাবে কোন্ দিন সাপের কামড়ে কিংবা বাঘের পেটে।

সত্য কথা, নদীর ধারে সাপের উপদ্রব খুব এবং বাঘও মাঝে মাঝে দুই-একটা ছটকাইয়া আসিয়া পড়ে। রংলাল সে সব গ্রাহ্যই করে না, সে নদীর ধারে গিয়া একটা গাছতলায় গামছা বিছাইয়া শুইয়া পড়ে। মহিষ দুইটা ঘাস খাইয়া বেড়ায়। উহারা দূরে গিয়া পড়িলে সে মুখে এক বিচিত্র শব্দ করে, আঁ—আঁ! অবিকল মহিষের ডাক! দূর হইতে সে শব্দ শুনিয়া কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ ঘাস খাওয়া ছাড়িয়া মুখ উঁচু করিয়া শোনে, তারপর উহারাও ওই আঁ—আঁ শব্দে সাড়া দিতে দিতে দ্রুতবেগে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া আসে; কখনও কখনও বা ছুটিতে আরম্ভ করে! রংলালের কাছে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়ায়, যেন প্রশ্ন করে—ডাকিতেছ কেন ?

রংলাল দুইটার গালেই দুই হাতে একটা করিয়া চড় বসাইয়া দিয়া বলে, পেটে তোদের আগুন লাগুক। খেতে খেতে কি বেলাত চলে যাবি না কি ? এই কাছে-পিঠে চরে খা।

মহিষ দুইটা আর যায় না, তাহারা সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া রোমন্থন করে। কখনও বা নদীর জলে আকণ্ঠ ডুবিয়া বসিয়া থাকে; রংলাল ডাকিলে জলসিক্ত গায়ে উঠিয়া আসে।

মাঠে যখন সে লাঙল চালায়, তখন প্রকাণ্ড বড় লাঙলখানা সজোরে মাটির বুকে চাপিয়া ধরে, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অবলীলাক্রমে টানিয়া চলে, প্রকাণ্ড বড় বড় মাটির চাঁই দুই ধারে উল্টাইয়া পড়ে। এক হাতেরও উপর গভীর তলদেশ উন্মুক্ত হইয়া যায়। প্রকাণ্ড বড় গাড়িটায় একতলা ঘরের সমান উঁচু করিয়া ধানের বোঝা চাপাইয়া দেয়—লোকে সবিস্ময়ে দেখে; রংলাল হাসে।

মধ্যে মধ্যে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে লইয়া বিষম বিপদ বাধিয়া উঠে। এক-একদিন তাহাদের মধ্যে কী মনান্তর যে ঘটে;—উহারা দুইটা যুধ্যমান অসুরের মতো

সামনাসামনি দাঁড়াইয়া ক্রোধে ফুলিতে থাকে। মাথা নীচু করিয়া আপন আপন শিঙ উদ্যত করিয়া সম্মুখের দুই পা মাটিতে ঠুকিতে আরম্ভ করে, তারপরই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। এক রংলাল ছাড়া সে সময় আর কেহ তাহাদের মধ্যে যাইতে সাহস করে না। রংলাল প্রকাণ্ড একগাছা বাঁশের লাঠি হাতে নির্ভয়ে উহাদের মধ্যে পড়িয়া দুর্দান্তভাবে দুইটাকে পিটাইতে আরম্ভ করে। প্রহারের ভয়ে দুইটাই সরিয়া দাঁড়ায়। রংলাল সেদিন দুইটাকেই সাজা দেয়, পৃথক গোয়ালে তাহাদের আবদ্ধ করিয়া অনাহারে রাখে; তারপর পৃথকভাবেই তাহাদের স্নান করাইয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া তবে একসঙ্গে মিলিতে দেয়; সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপদেশও দেয়, ছিঃ, ঝগড়া করতে নাই। একসঙ্গে মিলে-মিশে থাকবি—তবে তো!

যাক। বৎসর তিনেক পরে অকস্মাৎ একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। গ্রীষ্মের সময় রংলাল নদীর ধারে বেশ একটি কুঞ্জবনের মতো গুল্মাচ্ছাদনের মধ্যে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন ছিল। কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অদূরেই ঘাস খাইতেছে। অকস্মাৎ একটা বিজাতীয় ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দে ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়াই রংলালের রক্ত হিম হইয়া গেল। নিবিড় গুল্মবনটার প্রবেশ-পথের মুখেই একটা চিতাবাঘ হিংস্র দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। হিংস্র লোলুপতায় তাহার দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সে ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দ করিয়া বোধ হয় আক্রমণের সূচনা করিতেছে। রংলাল ভীরু নয়, সে পূর্বে পূর্বে কয়েকবার চিতাবাঘ শিকারে একা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। রংলাল বেশ বুঝিতে পারিল—সঙ্কীর্ণ প্রবেশ-পথের জন্যই বাঘটা ভিতরে প্রবেশ করিতে ইতস্তত করিতেছে। নতুবা ঘুমন্ত অবস্থাতেই সে তাহাকে আক্রমণ করিত। সে দ্রুত হামাগুড়ি দিয়া বিপরীত দিকে পিছাইয়া গিয়া কুঞ্জবনটার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড গাছটাকে আড়াল করিয়া আরম্ভ করিল, আঁ—আঁ—আঁ!

মুহূর্তের মধ্যে উত্তর আসিল, আঁ—আঁ—আঁ!

বাঘটা চকিত হইয়া কুঞ্জবনটার মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া চারিদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল—উহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। সেও দন্ত বিস্তার করিয়া গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। রংলাল দেখিল—কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণের সে এক অদ্ভুত মূর্তি! তাহাদের এমন ভীষণ রূপ সে কখনও দেখে নাই। তাহারা ক্রমশ পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া বিপরীত দিকে চলিতেছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল—বাঘটার এক দিকে কালাপাহাড়, অন্যদিকে কুম্ভকর্ণ, মধ্যে বাঘটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়াছে। বাঘটা ছোট, তবুও সে বাঘ। সে বোধ হয় অসহিষ্ণু হইয়া অকস্মাৎ একটা লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণের উপর পড়িল। পরমুহূর্তেই কালাপাহাড় তাহার উদ্যত শিঙ লইয়া তাহাকে আক্রমণ

করিল। কালাপাহাড়ের শৃঙ্গাঘাতে বাঘটা কুম্ভকর্ণের পিঠ হইতে ছিটকাইয়া দূরে পড়িয়া গেল। আহত কুম্ভকর্ণ উন্মত্তের মতো বাঘটার উপর নতমস্তকে উন্নত শৃঙ্গ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। কুম্ভকর্ণের শিঙ দুইটা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং অপেক্ষাকৃত সোজা—একটা শিঙ বাঘটার তলপেটে সোজা ঢুকিয়া গিয়া বাঘটাকে যেন গাঁথিয়া ফেলিল। মরণযন্ত্রণা-কাতর বাঘটাও দারুণ আক্রোশে তাহার ঘাড়টা কামড়াইয়া ধরিল। ওদিক হইতে কালাপাহাড়ও আসিয়া বাঘটার উপর শৃঙ্গাঘাত আরম্ভ করিল। রংলালও তখন বাহির হইয়া আসিয়াছে, সেও দারুণ উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্যের মতো, চালাইতে আরম্ভ করিল তাহার বাঁশের লাঠি। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুধ্যমান দুইটা জন্তুই মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। বাঘটার প্রাণ তখনও থাকিলেও অত্যন্ত ক্ষীণ, শরীরে শুধু দুই একটা আক্ষেপমাত্র স্পন্দিত হইতেছিল। কুম্ভকর্ণ পড়িয়া শুধু হাঁপাইতেছিল, তাহার দৃষ্টি রংলালের দিকে। চোখ হইতে দরদর ধারে জল গড়াইতেছে।

রংলাল বালকের মতো কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বিপদ হইল কালাপাহাড়কে লইয়া। সে অবিরাম আঁ—আঁ করিয়া চীৎকার করে আর কাঁদে।

রংলাল বলিল, জোড় নইলে ও থাকতে পারছে না। জোড় একটা এই হাটেই কিনতে হবে।

পর হাটেই সে অনেক দেখিয়া শুনিয়া চড়া দামে কালাপাহাড়ের জোড় কিনিয়া ফেলিল। টাকা লাগিল অনেক। একটারই দাম দিতে হইল দেড়শত টাকা। কিন্তু তবুও কালাপাহাড়ের যোগ্য সাথী হইল না। তবে এটার বয়স এখনও কাঁচা, এখনও বাড়িবে। ভবিষ্যতে দুই-এক বৎসরের মধ্যেই কালাপাহাড়ের সমকক্ষ হইবে বলিয়াই মনে হয়। এই তো সবে চারখানি দাঁত উঠিয়াছে।

কালাপাহাড় কিন্তু তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে শিঙ বাঁকাইয়া পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। রংলাল তাড়াতাড়ি কালাপাহাড়কে শিকলে আবদ্ধ করিয়া দূরে বাঁধিয়া বলিল, পছন্দ হচ্ছে না বুঝি ওকে? না, ওসব হবে না। মারলে হাড় ভেঙে দোব তোমার তা হলে হ্যাঁ!

নূতনটাকেও বাঁধিয়া জাব দিয়া সে বাড়ির ভিতর আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, কালাপাহাড় তো খেপে উঠেছে একে দেখে। সে রাগ কত!

যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব!—কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

রংলালও হাসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে!

মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু।

তা বটে! রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠ ওঠ চল, জল তেল সিঁদুর হলুদ নিয়ে চল।

ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়ল মাশায়, শীগগির এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলল!

সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে!

রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোজ উপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙারছে! এতক্ষণ হয়তো মেরেই ফেলালে!

রংলাল আসিয়া দেখিল রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটিটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নূতন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নূতনটা একে কালাপাহাড়ের অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মতো পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার পর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে।

রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া উঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তাহার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে, কোন্‌দিন হয়তো মেরেই ফেলাবে আমাকে।

রংলাল বলিল, যাঃ, ফোঁসফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই, চল দেখি—দেখি!

রংলাল কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রক্তচক্ষু লইয়া রংলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কালাপাহাড় তাহার মুখটা রংলালের কোলে তুলিয়া দিল। রংলাল পরম স্নেহে তাহার মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু রাখাল তো অহরহ কালাপাহাড়ের কাছে থাকিতে পারে না যে, তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিবে। অন্য কেহ গেলেই কালাপাহাড় অশান্ত স্বভাবের পরিচয় দেয়। মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া চীৎকার আরম্ভ করে—আঁ-আঁ-আঁ।

সে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া কুম্ভকর্ণকে খোঁজে। দড়ি ছিঁড়িয়া সে ডাকিতে ডাকিতে ওই নদীর ধারের দিকে চলিয়া যায়। রংলাল ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে ফিরাইতে গেলেই সে রুখিয়া দাঁড়ায়।

সেদিন আবার একটা গোরুর বাছুরকে মারিয়া ফেলিল। এই বাছুরটির সহিত উহাদের বেশ একটি মিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। কুম্ভকর্ণ ও কালাপাহাড় যখন পূর্ণ উদরে রোমন্থন করিত, তখন সে আসিয়া তাহাদের ডাবা হইতে জাব খাইয়া যাইত। নিতান্ত অল্প বয়সে বহু দিন অবুঝের মতো সে তাহাদের পেটতলায় মাতৃস্তন্যের সন্ধান করিত। কিন্তু সেদিন কালাপাহাড়ের মেজাজ ভালো ছিল না, বাছুরটা ডাবায় জাব খাইবার জন্য আসিয়া তাহার মুখের সম্মুখ দিয়াই মুখ বাড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড ক্রোধে শিঙ দিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল।

যশোদা আর রংলালের অপেক্ষা করিল না। সে পাইকার ডাকিয়া কালাপাহাড়কে বিক্রয় করিয়া দিল। নিতান্ত অল্প দামেই বেচিতে হইল।

পাইকারটা বলল, ষাট টাকাই হয়তো আমার লোকসান হবে। এ গরম মোষ কি কেউ নেবে মশায়?

যশোদা অনেক কথা কাটাকাটি করিয়া আর পাঁচটি টাকা মাত্র বাড়াইতে সক্ষম হইল। পাইকারটা কালাপাহাড়কে লইয়া চলিয়া গেল।

রংলাল নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

আঁ—আঁ—আঁ!

রংলাল তখনও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আঁ—আঁ শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সত্যই তো কালাপাহাড়! কালাপাহাড় ফিরিয়া আসিয়াছে। রংলাল ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। কালাপাহাড় তাহার কোলে মাথাটা তুলিয়া দিল।

পাইকারটা আসিয়া বলিল, আমার টাকা ফিরে দেন মশায়। এ মোষ আমি নেব না। বাপ রে, বাপ রে! আমার জান মেরে ফেলাত মশায়!

জানা গেল, খানিকটা পথ কালাপাহাড় বেশ গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরই সে এমন খুঁট লইয়া দাঁড়াইল যে, কার সাধ্য উহাকে এক পা নড়ায়!

পাইকারটা বলিল, লাঠি যদি তুললাম মশায়—ওরে বাপ রে, সে ওর চাউনি কি! তারপর এমন তাড়া আমাকে দিলেক, আমি আধকোশ ছুটে পালাই তবে রক্ষে। তখন

উ আপনার ফিরল, একবারে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে এল। আমার টাকা কটা ফিরে দেন মশায়।

সে আপনার টাকা ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যশোদা বলিল, এক কাজ কর তবে, হাটে যাও বরং।

রংলাল বলিল, আমি পারব না।

আর কে নিয়ে যেতে পারবে, তুমি না গেলে?

অগত্যা রংলালই লইয়া গেল। পথে সে অনেক কাঁদিল। এই হাট হইতেই কালাপাহাড়কে সে কিনিয়াছিল।

কিন্তু ফিরিল সে হাসিতে হাসিতে। কালাপাহাড়কে কেহ কেনে নাই। ওই পাইকারটা সেখানে এমন দুর্নাম রটাইয়াছে যে কেহ তাহার কাছ দিয়াও আসে নাই।

যশোদা বলিল, তবে পরের হাটে যাও। এদিককার পাইকার ও হাটে বড় যায় না।

রংলালকে যাইতে হয়। যশোদা লেখাপড়াজানা রোজগেরে ছেলে, সে এখন বড় হইয়াছে, তাহাকে লঙ্ঘন রংলাল করিতে পারে না। আর কালাপাহাড়কে রাখিবার কথা যে সে জোর করিয়া বলিতে পারে না! অনেক ক্ষতিই যে হইয়া গেল! মহিষটার দাম দেড় শত টাকা, তারপর গোহত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্তের খরচ সাত-আট টাকা! এই এক মাস চাষ বন্ধ হইয়া আছে, সে ক্ষতির মূল্য হিসাব-নিকাশের বাহিরে। হাটে একজন পাইকার কালাপাহাড়কে দেখিয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কিনিল, এক বড় জমিদারের এমনই একটি মহিষের বরাত আছে। দামও সে ভালোই দিল—একশো পাঁচ টাকা।

রংলাল বলিল, এই দেখ ভাই, মোষটা আমার ভারি গা-ঘেঁসা। এখন এইখানে যেমন বাঁধা আছে থাক, আমি চলে যাই, তারপর তোমরা নিয়ে যেও। নইলে হয়তো চেঁচাবে, দুষ্টুমি করবে।

তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। পাইকারটা হাসিয়া বলিল, তা বেশ, থাকুক এইখানেই। তুমি যাও।

রংলাল তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া একেবারে শহরের স্টেশনে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। হাঁটিয়া ফিরিবার মতো শক্তি তাহার ছিল না।

কিছুক্ষণ পরই পাইকার কালাপাহাড়ের দড়ি ধরিয়া টান দিল। কালাপাহাড় তাহার দিকে চাহিয়া চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ডাকিল, আঁা—আঁা—আঁা!

সে রংলালকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু কই—সে কই? পাইকারটা লাঠি দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া তাড়া দিল, চল চল।

কালাপাহাড় আবার ডাকিল, আঁ—আঁ—আঁ!

সে খুঁট পাতিয়া দাঁড়াইল, যাইবে না।

পাইকারটা আবার তাহাকে আঘাত করিল। কালাপাহাড় পাগলের মত চারিদিকে রংলালকে খুঁজিতেছিল।

কই, সে কই? নাই, সে তো নাই!

কালাপাহাড় দুর্দান্ত টানে পাইকারের হাত হইতে আপন গলার দড়ি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিল।

এই পথ! এই পথ দিয়া তাহারা আসিয়াছে। ঊর্ধ্বমুখে সে ছুটিতেছিল, আর প্রাণপণে ডাকিতেছিল, আঁ—আঁ—আঁ!

পাইকারটা কয়েক জনকে জুটাইয়া লইয়া কালাপাহাড়ের পথরোধ করিল, কিন্তু দুর্দান্ত কালাপাহাড় পিঠের উপর লাঠিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া সম্মুখের লোকটাকেই শিঙ দিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া আপন পথ মুক্ত করিয়া লইয়া উন্মত্তের মতো ছুটিল।

কিন্তু এ কি! এ সব যে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত!

শহরের রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দোকান, এত জনতা! ওটা কী?

একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিতেছিল। কালাপাহাড় ভয়ে একটা পাশের রাস্তা দিয়া ছুটিল।

রাস্তার লোকজন হৈ হৈ করিতেছিল, কার মোষ? কার মোষ? ও কি অদ্ভুত আকার—বিকট শব্দ!

একখানা মোটরকার আসিতেছে। কালাপাহাড়ের জ্ঞান লোপ পাইয়া গেল, তাহার মনশ্চক্ষে আপনার বাড়িখানি দেখিতেছিল, আর রংলালকে তারস্বরে ডাকিতেছিল। সে একেবারে একখানা পানের দোকান চুরমার করিয়া দিয়া আবার বিপরীত দিকে ফিরিল।

লোকজন প্রাণভয়ে ছুটিয়া পালাইতেছিল। কালাপাহাড়ও প্রাণভয়েই ছুটিতেছিল। দেখিতে দেখিতে দুইটা লোক জখম হইয়া গেল। কালাপাহাড় ছুটিতেছে, আর রংলালকে ডাকিতেছে, আঁ—আঁ—আঁ! কিন্তু এ কী! ঘুরিয়া ফিরিয়া সে কোথায় যাইতেছে? কোথায় কত দূরে তাহার বাড়ি?

আবার সেই বিকট শব্দ! সেই অপরিচিত জানোয়ার! এবার সে ক্রুদ্ধ বিক্রমে তাহার সহিত লড়িবার জন্য দাঁড়াইল।

মোটরখানাও তাহারই সন্ধানে আসিয়াছে। পুলিস সাহেবের মোটর। পাগলা মহিষের সংবাদ পৌঁছিয়া গিয়াছে।

মোটরখানাও দাঁড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড বিক্রমে অগ্রসর হইল।—কিন্তু

তাহার পূর্বেই ধ্বনিত হইল একটা কঠিন উচ্চ শব্দ। কালাপাহাড় কিছু বুঝিল না, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন নিদারুণ যন্ত্রণা—মুহূর্তের জন্য। তারপর সে টলিতে টলিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সাহেব রিভলবারটা খাপে পুরিয়া সঙ্গের কনেস্টবলকে নামাইয়া দিলেন, বলিলেন, ডোমলোগকো বোলাও।

তাসের ঘর

অমর শখ করিয়া চায়ের বাসনের সেট কিনিয়াছিল। ছয়টা পিরিচ-পেয়ালা, চাদানি ইত্যাদি রং-চং-করা সুদৃশ্য জিনিস, দামও নিতান্ত অল্প নয়,—চার টাকা। চার টাকা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে অনেক।

অমরের মায়ের হুকুম ছিল, সেটটি যত্ন করে তুলে রেখো বউমা, কুটুম্বসজ্জন এলে, ভদ্রলোকজন এলে বের কোরো।

কলিকাতা-প্রবাসী হরেন্দ্রবাবুরা দেশে আসিয়াছেন, আজ তাঁহাদের বাড়ির মেয়েরা অমরদের বাড়িতে বেড়াইতে আসিবেন ; তাহারই উদ্যোগ-আয়োজনে বাড়িতে বেশ সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে !

মা বলিলেন, চায়ের সেটটা আজ বের কর তো গৌরী !

গৌরী বাড়ির মেয়ে—অমরের অবিবাহিতা ভগ্নী। মা চাবির গোছাটা গৌরীর হাতে দিলেন। গৌরী বাসনের ঘর খুলিয়া জার্মান সিল্‌ভারের ট্রে-সমেত সেটটি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল, পাঁচটা কাপ রয়েছে কেন মা, আর একটা কাপ কি হল ? এই দেখ বাপু সবে এই আমি বের করে আনছি, আমার দোষ দিও না যেন !

বিরক্ত হইয়া মা বলিলেন, দেখ না ভালো করে খুঁজে, ঘরেই কোথাও আছে। পাখা হয়ে উড়ে তো যাবে না !

গৌরী সেটটা সেইখানে নামাইয়া আবার ভালো করিয়া ঘর খুঁজিয়া আসিয়া বলিল, পাখাই হল, না কেউ খেয়েই ফেলল, সে আমি জানি না বাপু, তবে ঘরের মধ্যে কোথাও নেই।

দুমদাম করিয়া মা ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, তোমার দোষ কি মা, আমার কপালের দোষ ! তোমরা চোখ কপালের ওপর তুলে কাজ কর, নীচের জিনিস দেখতে পাও না।

গৌরীর চোখ হয়তো কপালের উপরেই উঠিয়া থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে গৌরীর অপরাধ প্রমাণিত হইল না।— পেয়ালাটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

মা হাঁকিলেন, বউমা বউমা!

বউমা—অমরের স্ত্রী শৈল—উপরে তখন ঘর-দুয়ার ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া অতিথিদের বসিবার স্থান করিতেছিল, সে নীচে আসিয়া শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আমায় ডাকছেন?

শাশুড়ী বাসন-অন্ত-প্রাণ, সিন্দুকের চাবি পুত্রদের দিয়া বাসনের ঘরে চাবি লইয়াই বাঁচিয়া আছেন। পেয়ালাটার খোঁজ না পাইয়া ফুটন্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত বার্তাকুর মতো সশব্দে জ্বলিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, হ্যাঁ গো রাজার কন্যে, নইলে বউমা বলে ডাকা কি ওই বাউড়িদের না ডোমেদের?

শৈল নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর করা তার অভ্যাস নয়।

শাশুড়ী বলিলেন, একটা পেয়ালা পাওয়া যাচ্ছে না কেন, কী হল? একটু নীরব থাকিয়া বধূ বলিল, ওটা আমিই ভেঙে ফেলেছি মা।

শাশুড়ী কিছুক্ষণ বধূর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বেশ করেছ মা, কী আর বলব বল!

সত্য কথা, এমন অকপটভাবে অপরাধ স্বীকার করিলে অপরাধীকে মার্জনা করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া শাশুড়ী বলিলেন, ও পাঁচটাকেও ফেলে দেব আমি চুরমার করে ভেঙে।

রাগ গিয়া পড়িল চায়ের সেটটার উপর।

শৈল সবই সহ্য করে, সে নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিলেন, ভেঙেছ বলা হল, বেশ হল, আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, ওপরের কাজ সেরে এস, জলখাবারগুলো করতে হবে।

শৈল উপরে চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরেই হাসিমুখে আসিয়া রান্নাঘরে শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইল।

শাশুড়ীর মনের উত্তাপ কমিয়া আসিয়াছিল, বলিলেন, নাও, তোমাদের দেশের মতো খাবার তৈরি কর।

শৈল খাবারের সাজ-সরঞ্জাম টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, সমস্তর ভেতরেই মাছের পুর দোব তো মা?

অ্যাঁ, মাছের পুর? হ্যাঁ, তা দেবে বইকি, বিধবা তো কেউ আসছে না!

ময়দার ঠোঙার ভিতরে মাছের পুর দিতে দিতে শৈল বলিল, জানেন মা, এর সঙ্গে যদি একটুখানি হিং দেওয়া হত—ভারি চমৎকার হত। বাবার আমার হিং

ভিন্ন কোন জিনিস ভালো লাগে না। আর যে-সে হিং আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেন না ; আফগানিস্থান থেকে কাবুলী সব আসে, তারাই দিয়ে যায়।

শাশুড়া বলিলেন, পশ্চিম ভালো জায়গা মা, আমাদের পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে কি তুলনা হয়, না সেসব জিনিস পাওয়া যায় ?

শৈল বলিল, পশ্চিমেও সে হিং পাওয়া যায় না, মা। কাবুলীরা সেসব নিজেদের জন্যে আনে, শুধু বাবাকে খুব খাতির করে কিনা, টাকা-কড়ি অনেক সময় নেয়—তাই সে জিনিস দেয়। শুধু কি হিং, যখন আসবে তখন প্রত্যেকে আঙুর, বেদানা, নাশপাতি, বাদাম, হিং—এ সব ছোট ছোট ঝুড়ি দিয়ে যায়। পাঁচজনের মিলে সে হয় কত ! কাঁচা জিনিস অনেক পচেই যায়।

ও ঘরের বারান্দা হইতে ননদ গৌরী মৃদুস্বরে বলিল, এই আরম্ভ হল এইবার।

অর্থাৎ বাপের বাড়ির গল্প আরম্ভ হইল। সত্য কথা, শৈলর ওই এক দোষ ; বিনীত, নম্র, মিষ্টমুখী, সুন্দরী বউটি প্রত্যেক কথায় তাহার বাপের বাড়ির তুলনা না দিয়া থাকিবে না।

পাশের বাড়িতে তুমুল কোলাহল উঠিতেছিল, শাশুড়ী এবং বধূতে কলহ বাধিয়াছে।

শৈলর শাশুড়ী বলিলেন, যা হবে তাই হোক মা। আমার বউ ভালো হয়েছে, উত্তর করতে জানে না ; দোষ করলে বকব কি ! মুখের দিকে চাইলে মায়া হয়।

শৈল বলিল, ওঁর ছেলে স্ত্রীকে শাসন করেন না কেন ? জানেন মা, আমার দাদা হলে আর রক্ষে থাকত না। সঙ্গে সঙ্গে বউকে হয়তো বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। একবার বউদি কি উত্তর করেছিলেন মায়ের সঙ্গে দাদা তিন মাস বউদির সঙ্গে কথা কন নি। শেষে মা আবার বলেকয়ে কথা বলান। তবে দাদার আমার বড্ড বাতিক—খদ্দর পরবে হাঁটু পর্যন্ত, জামা সেই হাতকাটা—এতটুকু ; তামাক না, বিড়ি না, সিগারেট না,—সে এক বাতিকের মানুষ !

শাশুড়ী বোধ হয় মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, নাও নাও, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নাও ; দেখো, যেন মাছের কাঁটা না থাকে !

শৈল বলিল, ছোট মাছ—কাঁটা বাছতেই হাত চলছে না মা ; তবে এই হয়ে গেল।

কড়ায় এক ঝাঁক শিঙাড়া ছাড়িয়া দিয়া, সে আবার বলিল, মা আমার কক্ষনো ছোট মাছ বাড়িতে ঢুকতে দেন না। দু সেরের কম মাছ হলেই, সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেবেন। কুচো-মাছের মধ্যে ময়া, আর কাঠ-মাছের মধ্যে মাগুর।

শাশুড়ী বাধা দিয়া বলিলেন, নাও নাও ; সেরে নিয়ে চুলটুল বেঁধে ফেল গে।

কেশ প্রসাধন অন্তে শৈল কাপড় ছাড়িতেছিল।

ননদ গৌরী প্রশংসমান দৃষ্টিতে ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, উঃ, রং বটে তোমার বউদি! তুমি যা পরবে, তাতেই তোমাকে সুন্দর লাগবে, আর আমাদের দেখ না, যেন কাঠ পুড়িয়ে--

শৈল বলিল, এ যে দেবার নয় ভাই, নইলে তোমাকে দিতাম। আমার আর কী রং দেখছ! বাবা মা দাদা আমার অন্য বোনেদের যদি দেখতে, তবে দেখতে রং কাকে বলে; ঠিক একেবারে গোলাপ ফুল।

গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল, বল কি বউদি, তোমার চেয়ে ফরসা রং?

হ্যাঁ ভাই, বাড়ির মধ্যে আমিই কালো।

শাশুড়ী আসিয়া চাপা গলায় বলিলেন, আর কত দেরি বউমা, ওঁরা যে সব এসে গেছেন।

শৈল তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া বলিল, এই যে মা হয়ে গেছে আমার।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের মহার্ঘ উজ্জ্বল সজ্জা ভূষণ রূপ সমস্তকে লজ্জা দিয়া শৈল আবির্ভূতা হইল—নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্রকলার মতো।

প্রবাসিনীর দল মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল, শৈল হাসিমুখে প্রণাম করিল।

ও বাড়ির গিন্নী বলিলেন, এ যে চাঁদের মতো বউ হয়েছে তোমার দিদি! লেখাপড়া-টড়াও জানে নাকি?

শৈল মৃদুস্বরে বলিল, স্কুলে তো পড়ি নি, বাবা স্কুলের শিক্ষা বড় পছন্দ করেন না। বাড়িতে পড়েছি, ম্যাট্রিক স্ট্যাণ্ডার্ড শেষ হয়েছিল; তারপরই—

কথাটা অসমাপ্ত থাকিলেও ইঙ্গিতে সমাপ্ত হইয়া গেল।

ও বাড়ির গিন্নী বলিলেন, কে জানে মা, আজকাল কী যে হাল হল দেশের, মেয়েদের আর কলেজে না পড়লে বিয়ে হচ্ছে না! আমার বউরা তো কলেজে পড়ছিল সব; বিয়ের পর আমি ছাড়িয়ে দিলাম।

শৈল উত্তর দিল, কলেজের কোর্স আমিও কিছু পড়েছি। তবে আমার বোনরা সব ভালো করে পড়েছে; বাড়িতে দাদাই পড়ান, পড়াশোনায় দাদার ভয়ানক বাতিক কিনা, জানেন—বছরে পাঁচ-সাত শো টাকার বই কেনেন—বাংলা, ইংরিজী! বিলেত থেকে ইংরিজী বই আনাবেন। কাজকর্ম যদি করতে বলবেন মা,—কাজকর্ম অবিশ্যি বাবারই বিজনেস আছে—সেই বিজনেস দেখতে বলেন তো বলবেন, সম্মুখে জ্ঞানসমুদ্র মা, চোখ ফেরাবার আমার অবকাশ নেই।

কোথায় তোমার বাপের বাড়ি?

এলাহাবাদ। এলাহাবাদ গেছেন নিশ্চয়ই, আমাদের সেখানে তিন পুরুষ বাস হয়ে গেল। বাবা সেখানে কণ্ট্রাক্টরি করেন।

কী রকম পান-টান?

আমি তো ঠিক জানি না। তবে মেজ ভাই বলেন মাঝে মাঝে, এ রকম করে আর চলবে না মা, তুমি বাবাকে বল। পাকা বাড়িগুলো ভাড়া দিয়ে নিজে সেই খোলার বাড়িতে থাকবেন, টোঙায় চড়ে কাজ দেখে বেড়াবেন, মটর কিনবেন না, এ করে চলবে না। বাবা বলেন, এ আমার পৈত্রিক বাড়ি, যেমন আছে তেমনই থাকবে, ভাঙবও না, অন্য কোথাও যাবও না। আর গাড়ি। গাড়িও আমি কিনব না, ছেলেরা বিলাসী হবে। আমি রোজগার করছি, তারা যদি না পারে! জানেন, লোকে বলে—মহেন্দ্রবাবু এক হিসেবে সন্ন্যাসী!

শৈল কথা শেষ করিয়া মৃদু মৃদু মিষ্ট হাসি হাসে।

প্রবাসিনী গিন্নী এবার শৈলর শাশুড়ীকে বলিলেন, তা হলে ছেলের তোমার বেশ বড় ঘরেই বিয়ে হয়েছে দিদি। তোমাদের চেয়ে অনেক বড় ঘর। তত্ত্ব-তল্লাস করেন কেমন বেয়াইরা?

বিচিত্র সংসার, বিচিত্র মানুষের মন, কোন্ কথায় কে যে আঘাত পায় সে বোঝা, বোধ করি, বিধাতারও সাধ্য নয়! তোমাদের চেয়ে বড় ঘর—এই কথাটুকুতেই অমরের মা আহত হইয়া উঠিলেন, তিনি মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, কে জানে দিদি, বড় না ছোট সে জানি না। তবে বউমাই বলেন, বাপেদের এই, বাপেদের ওই; কিন্তু তত্ত্বতল্লাসও দেখি না, আজ দু বছর ওই দুধের মেয়ে এসেছে, নিয়ে যাওয়ার নাম পর্যন্ত নেই!

শৈল মুহূর্তে বলিয়া উঠিল, জানেন তো মা, বাবার আমার অদ্ভুত ধরন! তিনি বলেন, যে বস্তু আমি দান করলাম, সে আবার আমি কেন 'আমার' বলে আমার ঘরে আনব! তবে যাকে দান করলাম—সে যদি স্বেচ্ছায় নিয়ে আসে, তখন তাদের আদর করব, সম্মান করব, আমার বলব। আর তত্ত্ব-তল্লাস এত দূর থেকে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না; কিন্তু টাকা তো চাইলেই দেন তিনি, যখন চাইবেন তখনই দেবেন।

শাশুড়ী বলিয়া উঠিলেন, কী বললে বউমা, তোমার বাবা আমাদের টাকা দেন—কখন, কোন্ কালে?

শৈল বলিল, আপনাদের কথা তো বলি নি মা; আপনি জিজ্ঞেস করে দেখবেন, একশো পঞ্চাশ আশি—চাইলেই তিনি দেন, কেন দেবেন না?

শাশুড়ীর মুখ কালো হইয়া উঠিল। শুধু স্বগ্রামবাসী নয়, উপস্থিত মহিলাবৃন্দ প্রবাসিনী—দেশ-দেশান্তরে এ সংবাদ রটিয়া যাইবে। অমরের মায়ের মাথা যেন কাটা গেল।

তিনি বলিলেন, ভালো, অমর আসুক, আমি জিজ্ঞাসা করব। ঘুণাক্ষরেও তো আমি জানি না!

ও বাড়ির গিন্নী বললেন, তোমায় হয়তো বলে নি অমর। দরকার হয়েছে, শ্বশুরের কাছে নিয়েছে।

অমরের মা বলিলেন, সে নেবে কেন ভাই? সে নেওয়া যে তার অন্যায়—নীচ কাজ। ছিঃ, শ্বশুরের কাছে হাত পাতা, ছিঃ!

অমর কাজ করে কলিকাতায়, সেখানে সে অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করিয়া থাকে। ব্যবসা হইলেও ক্ষুদ্র তার আয়তন, সঙ্কীর্ণ তার পরিধি, তবুও সে স্বাধীন; তাই মাসে দুইবার করিয়া বাড়ি সে আসিয়া থাকে। অমরের মা রোষকষায়িত নেত্রে পুত্রের আগমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের সম্মুখে যে অপমান তাঁহার হইয়াছে, সে তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। শুধু তাঁহার সংসারের অস্বচ্ছলতাই নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই; তাঁহাকে মিথ্যাবাদিনী সাজিতে হইয়াছে। এ কয়দিন বধূর সঙ্গেও একরূপ বাক্যালাপ করেন নাই। শৈল অবশ্য সে বিষয়ে দোষী নয়, সে সদাসর্বদাই মুখে হাসিটি মাখিয়া শাশুড়ীর আজ্ঞার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

সংসারের নিয়ম—কাল অগ্নির উত্তাপও হরণ করিয়া থাকে, মনের আগুনও নিভিয়া আসে। কিন্তু শৈলর দুর্ভাগ্য, শাশুড়ীর মনের আগুন-শিখা হ্রস্ব হইতে না হইতে ইন্ধনের প্রয়োগে দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। পাড়ায় ঘরে ঘাটে এই লইয়া যে কানাকানি চলিতেছিল, সেটা ভালভাবেই ক্রমশ জানাজানি হইয়া গেল।

সেদিন সরকারদের মজলিশে একদফা প্রকাশ্য আলোচনার সংবাদ অমরের মা স্বকর্ণেই শুনিয়া আসিলেন।

দিন দশেক পরেই কিসের একটা ছুটি উপলক্ষ্যে অমর বাড়ি আসিবার কথা জানাইয়া দিল। শৈলর মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কথাটা মিথ্যা, বার বার সঙ্কল্প করিয়াও সে এ বিষয়ে স্বামীকে কোন কথা লিখিতে পারে নাই—কোন অনুরোধ জানাইতে কেমন যেন লজ্জা বোধ হইয়াছে, তাহার হাত চলে নাই, ঠোঁট কাঁপিয়াছে, চোখে জলও দেখা দিয়াছে; সে চিঠির কাগজখানা জড়ো করিয়া মুড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। শৈল আপনার শয়নকক্ষে স্তব্ধ প্রতীক্ষায় স্বামীর জন্য বসিয়া রহিল, অমর আসিলেই সে তাহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িবে।

অকস্মাৎ অমরের উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল, অন্ধকারের আবরণের

মধ্যে চোরের মতো নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া সে আশ্বস্ত হইল। ক্রোধের প্রসঙ্গ তাহাকে লইয়া নয়, অমর বচসা জুড়িয়া দিয়াছে কুলির সহিত।

এই আধ মাইল—মালের ওজন আধ মণ পঁচিশ সের, তোকে দু আনা দিলাম—আবার কত দোব?

লোকটাও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিতেছিল, তখন আপনি চুকিয়ে নেন নাই কেন মশায়? তখন যে একেবারে হুকুম ঝাড়লেন—এই—ইধার আও। আমাদের রেট তিন আনা করে, হ্যান, দিতে হবে!

নিকালো বেটা হারামজাদা, নিকালো বলছি—এই নে পয়সা—কিন্তু এখুনি নিকালো সামনে থেকে বলছি।

পয়সা ফেলিয়া দিয়া অমর ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বাড়ি ঢুকিল।

দেখ না. লোকসান যেদিন হয়, সেদিন এমনই করেই হয়। পঞ্চাশটা টাকা মেরে একজন পালাল, তারপর ট্রেন ফেল, আবার বাড়ি এসেও চারটে পয়সা লোকসান!

মাও বোধ করি প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি শান্ত অথচ শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, তার জন্যে আর তোমার চিন্তা কী বাবা? বড়লোক শ্বশুর রয়েছেন, তাঁকে লেখ, তিনি পাঠিয়ে দেবেন।

অর্থ না বুঝিলেও শ্লেষতীক্ষ্ণ বাক্যশর আঘাত করিতে ছাড়ে নাই। অমর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তার মানে?

মা বলিলেন, সেই জন্যই তো তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাবা। আমি শুনব—তুমি আমাকে তোমার রোজগারের অন্ন খাওয়াও, না তোমার শ্বশুরের দানের অন্নে আমাকে পিণ্ডি দাও? তুমি নাকি তোমার শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা চাও, আর শ্বশুর তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেন—একশো পঞ্চাশ আশি, যখন যেমন তোমার দরকার হয়?

ক্লান্ত তিক্তচিত্ত অমরের মস্তিষ্কে মুহূর্তে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, কে, কোন্ হারামজাদা হারামজাদী সে কথা বলে?

মা ডাকিলেন, বউমা!

শৈলর চক্ষের সম্মুখে চারিদিক যেন দুলিতেছে—কী করিবে, কী বলিবে কোন নির্ধারণই সে স্থির করিতে পারিল না।

শৈল বিহ্বলের মতো বলিয়া ফেলিল, হ্যাঁ, বাবা দেন তো!

অমর মুহূর্তে উন্মত্তের মতো দেওয়ালে মাথা কুটিতে আরম্ভ করিল। মা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

অমর বলিল, ও বাড়িতে থাকলে আমি জলগ্রহণ করব না।

মা বলিলেন, আমার মাথা কাটা গেল—হরেনবাবুর বাড়ির মেয়েদের কাছে। এমন বউ নিয়ে আমিও ঘর করতে পারব না বাবা।

বিচারক যেখানে বিধিবদ্ধ বিধানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সেখানে বিচার হয় না, বিচারের নামে ঘটে স্বেচ্ছাচার। তাই ঐটুকু অপরাধে শৈলর অদৃষ্টে গুরু দণ্ড হইয়া গেল, সেই রাত্রেই তাহার নির্বাসনের ব্যবস্থা হইল। রাত্রি বারোটার ট্রেনে শৈলর দেবর তাহাকে লইয়া এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেল।

শৈলকে দেখিয়াই তাহার মা আনন্দে বিস্ময়ে আকুল হইয়া বলিলেন, এ কি শৈল, তুই যে এমন হঠাৎ ?

শৈল ঢোঁক গিলিয়া বলিল, কেন মা, আমাকে কি আসতে নেই ? তোমরা তো আনলে না, কাজেই নিজেই এলাম।

মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মা বলিলেন, ওরে, আনতে কি অসাধ, না আমার মনেই ব্যথা হয় না, কিন্তু কী করব, বল ?

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, বাবুর রোজগার কমে গেছে, বাজার নাকি বড় মন্দা ! তার ওপর হৈমির বিয়ে এসেছে—খরচ যে করতে পারছি না মা।

শৈল অবকাশ পাইয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

মা বলিলেন, সঙ্গে কে এসেছে শৈলী, জামাই ?

শৈল বিবর্ণমুখে বলিল, না, আমার দেওর এসেছে।

কই সে, ওমা বাইরে কেন সে ?—ঘরের ছেলে। ওরে দাই, দেখ তো বড়দিদির দেওর বাইরে আছেন, ডাক তো ! বল, মা ডাকছেন। শৈলর বুক দুরদুর করিতেছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অমরের আদেশ ছিল, সে যেন এখানে জলগ্রহণ না করে। কঠিন শপথ দিয়া আদেশ দিয়াছে অমর।

দাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কই, কেউ তো নেই !

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, সে কি ? কোথায় গেল সে ?

শৈল বলিল, তাকে ট্রেন ধরতে হবে মা, সে চলে গেছে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে মা যেন অভিভূত হইয়া গেলেন। ট্রেন ধরতে হবে—চলে গেছে—সে কি ?

শৈল বলিল, তাকে সিমলে যেতে হবে মা—একটা খুব বড় কাজের সন্ধান করতে যাচ্ছে ; যে ট্রেনে আমরা নামলাম, এই ট্রেনই সে গিয়ে ধরবে, থাকবার তার উপায় নেই।

মা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, ফিরবার সময় নামতে বলে দিয়েছিস তো ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শৈল বলিল, বলে তো দিয়েছি মা, কিন্তু নামতে বোধ হয় পারবে না, খুব জরুরী কাজ কিনা ! সিমলে থেকে কলকাতায় যাবে একটা কার চিঠি নিয়ে, সময়ে পৌছুতে না পারলে তো সব মিছে হবে।

এই সময়েই শৈলর জ্ঞানান্বেষী বড়দাদা বাড়ি ঢুকিল। পরনে তাঁহার খদ্দর সত্য, কিন্তু জরিপাড় শৌখীন খদ্দরের ধুতি, গায়েও শৌখীন খদ্দরের পাঞ্জাবি, মুখে একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেট ; হাতে কতকগুলি মাছ ধরিবার চারের উপকরণ।

শৈলকে দেখিয়াই সে বলিল, আরে শৈলী কখন, অ্যাঁ ?

হাসিমুখে শৈল বলিল, এই সকালে দাদা, ভালো আছেন আপনি ?

হ্যাঁ। তা বেশ, কই, তুই নতুন লোক, খাস বাংলা দেশের মানুষ—কই, দে তো এই চারগুলো তৈরি করে, দেখি তোর হাতের কেমন পয় ! মাছ ধরতে যাব আজ দেহাতে—এক জমিদারের তালাওয়ে।

শৈল উপকরণগুলি হাতে লইয়া বলিল, চলুন না দাদা, একবার আমাদের ওখানে, কত মাছ ধরতে পারেন একবার দেখব !

তোদের ওখানে পুকুরে খুব মাছ, না রে ?

আমাদেরই পুকুরে খুব বড় বড় মাছ ;—আধ মণ, পনেরো সের, পঁচিশ সের এক-একটা মাছ।—জানেন দাদা, তখন প্রথম গেছি, একটা আঠারো সের কাতলা মাছ এনে দেওর বললে, বউদিকে কুটতে হবে ! ওরে বাপরে, সে যা আমার ভয় ! এখন আর ভয় হয় না—আধ মণ, পঁচিশ সের মাছ দিব্যি কেটে ফেলি।

যাবার ইচ্ছে তো হয় রে, হয়ে ওঠে না। কলকাতা যাই, তাও অমরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সময় হয় না। আবার তুই অবিশ্যি যদি কলকাতায় থাকতিস—তবে নিশ্চয় যেতাম।

শৈল বলিল, আচ্ছা দেখব, আমাদেরও কলকাতায় বাড়ি হবে এইবার—

অর্ধপথে বাধা দিয়া দাদা বলিল, কলকাতায় তোদের বাড়ি হচ্ছে নাকি ?

শৈল বলিল, জায়গা কিনছেন। ধীরে ধীরে হবে এইবার।

মা পুলকিত হইয়া প্রশ্ন করেন, জামাই এখন বেশ পাচ্ছেন, না রে শৈলী ?

শৈল মুখ নত করিয়া বলিল, দেশেও দালান করবেন।

মাস দুয়েক পরই কিন্তু শৈলর মা অনুভব করিলেন, কোথাও একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে, জামাই বা বেয়ান কেহই তো শৈলকে পত্র দেন না, সংবাদ লন না ! তিনি স্বামীকে বলিলেন, দেখ, তুমি বেয়ানকে একখানা পত্র লেখ !

মহেন্দ্রবাবু নিরীহ ব্যক্তি, শৈল অক্সের সম্বন্ধে যতই অত্যুক্তি করিয়া থাক, তাহার পিতার উপার্জনকে যতই বাড়াইয়া বলিয়া থাক, পিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে অত্যুক্তি সে করে নাই। সত্যই তিনি সাধুপ্রকৃতির নিরীহ ব্যক্তি।

মহেন্দ্রবাবু স্ত্রীর কথায় শঙ্কিত হইয়া পরদিনই বেয়ানকে পত্র দিলেন। লিখিলেন—

আমি আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তি, শৈলকে চরণে স্থান দিয়া আপনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি—প্রার্থনা করি, সে অনুগ্রহ হইতে আমি বা আমার শৈল যেন কখনও বঞ্চিত না হই। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সেখানে কী ঘটিয়াছে, শৈল কী অপরাধ করিয়াছে, কিন্তু অপরাধ যে করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে কোন কথা প্রকাশ করে নাই ; তবুও এই দীর্ঘ দুই মাসের মধ্যে কই আপনার কোন আশীর্বাদ তো আসিল না! শ্রীমান অমর বাবাজীবনও তো কোন পত্র দেন না! দয়া করিয়া কী ঘটিয়াছে, আমাকে জানাইবেন ; আমি নিজে শৈলকে আপনার চরণে উপস্থিত করিয়া তাহার শাস্তি দিব।

তারপর শেষে আবার লিখিলেন—

অমর সংবাদ না দিলেও শৈলর নিকট তাহার উন্নতির কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কলিকাতায় বাড়ি করিবে শুনিয়া পরম আনন্দ হইল। আপনার মেজছেলের পরীক্ষার সংবাদ শুনিলাম, কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম হইতে পারে নাই। আশীর্বাদ করি, বি. এ.-তে সে যোগ্য স্থান লাভ করিবে।

পত্রখানা পড়িয়া অমরের মায়ের চোখে জল আসিল।

মনে তাহার যে ক্রোধবহ্নি জ্বলিতেছিল, ইন্ধনের অভাবে, সময়ক্ষেপে সে বহ্নি নিভিয়া গিয়াছে। প্রতি পদে তাঁহার শৈলর প্রতিমার মতো মুখ মনে পড়িত। বলুক সে মিথ্যা, তবু মিষ্ট কথার সুরটি তাঁহার কানে বাজিত। আজ বেয়াইয়ের পত্র পড়িয়া তাঁহার সকল গ্লানি নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া গেল। শুধু বিদূরিত হইয়া গেল নয়, পুত্রবধূর উপর মন তাঁহার প্রসন্ন হইয়া উঠিল, পত্রের শেষভাগটুকু পড়িয়া আবার তিনি সেখানটা পড়িলেন,—কলিকাতায় বাড়ি, ইত্যাদি।

তিনি অমরকে পত্র দিলেন। বেয়াইকে লিখিলেন—

বউমা আমার ঘরের লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর কোন অপরাধ হয়? তবে কার্যগতিকে সংবাদ লইতে পারি নাই, সে দোষ আমারই। শীঘ্রই অমর বউমাকে আনিবার জন্য যাইবে।

পত্র পাইবামাত্র শৈল পুলকিত হইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল।

অমর আসিয়াছে। দশ-বারো সেরের একটা মাছ সে সঙ্গে আনিয়াছে। শৈল তাড়াতাড়ি সেটা কাটিতে বসিল।

বলিল, বড় জাতের মাছ বোধ হয় ধরা পড়েনি। এগুলো মাঝলা জাত।

ওদিক হইতে ভ্রাতৃজায়া বলিল, এই আরম্ভ হল। শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভাল আর কারও হয় না! রাত্রে অমরের নিকট শৈল নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। অমর একখানা পত্র বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, এসব কী বল তো? 'একটি বড় মাছ যেমন করিয়া হউক আনিবে, এখানে আমি আমাদের অনেক মাছ আছে বলিয়াছি।' বেশ, আমাদের ষোল আনা একটা পুকুর নেই, অথচ—ছিঃ! আর 'এখানে মুক্তার গহনার চলন হইয়াছে। আমার জন্য ঝুটা মুক্তার মালা একছড়া—' ওকি—ওকি, কাঁদছ কেন শৈল, শৈল?

শৈল বিছানায় মুখ গুঁজিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া তুলিল। সেকথা যে তাহার অমরকে মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়!

মতিলাল

'চোতপরব' অর্থাৎ গাজনের সং বাহির হইয়াছিল। ঢাকঢোল বাজাইয়া শোভাযাত্রার মধ্যে বাবা বুড়ো শিবের দোলা চলিয়া গেল, তাহার পিছনে পিছনে সঙের দল চলিতেছিল। একজন বাজিকর সাজিয়াছে, সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বড় ভালুক, একটা হনুমান, বাজিকরের বগলে একটা সাপের ঝাঁপি। এই বাজিকরের পিছনেই যত ছেলের ভিড়। কৌতূহলের সীমা নাই, অথচ ভয়ও আছে, একটু দূরে দূরে কোলাহল করিতে করিতে তাহারা চলিয়াছে। ভালুকটা প্রকাণ্ড বড়—বোধ হয় বুড়া—গায়ের রোঁয়াগুলো অনেক স্থলে উঠিয়া গিয়াছে। ছেলের পাল সেটাকে লক্ষ্য করিয়াই বাজিকরের অলক্ষ্যে ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়িতেছিল। বুড়া ভালুকটা কয়েকবার এমনিভাবে আঘাত পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গোঁ গোঁ করিয়া উঠিল। সভয় কৌতুকে ছেলের দল এদিকে ওদিকে ছুটিয়া পালাইয়া গেল। ভালুকটা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বাজিকরের সঙ্গে চলিতে লাগিল।

ছেলের দলের অগ্রগামী পার্বতী তাহার পার্শ্বচর মদনকে বলিল, মানুষ রে মানুষ—হাসছে! সেজেছে!

মদন বলিল, ধেত! নারানবাবুদের কাছারিতে জ্বরে কাঁপছিল দেখিস নি! ভালুক না হলে জ্বর আসে—কাঁপে! গাঁজা খেলে—

চোটা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্যামবাবুর বৈঠকখানাটা সম্মুখেই, সেখানে তখন শ্যামগোপালবাবু ইউনিয়ন বোর্ডের খাতাপত্র দেখিতেছিলেন। বাজিকরের

হনুমানটা 'উপ্' শব্দে লাফ দিয়া দাওয়ার উপর উঠিয়া বসিল, ভালুকটাও প্রণাম করিয়া ধপ করিয়া সেইখানে পড়িয়া জ্বরে কাঁপিতে আরম্ভ করিল। হনুমানটা প্রেসিডেণ্টবাবুকে দাঁত দেখাইয়া ঘন ঘন চোখ মিটমিট করিতে আরম্ভ করিল।

শ্যামবাবু অল্প একটু হাসিয়া বলিলেন, বেশ বেশ! ওবেলায় এসে পয়সা নিয়ে যাস।

বাজিকর জোড়হাত করিয়া বলিল, আজ্ঞে, এই বেলাতেই পেলে—

শ্যামবাবু বলিলেন, যা বেটা, দেখছিস না এখন সরকারী কাজ করছি!

বাজিকর আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, সে প্রণাম করিয়া ফিরিল।

শ্যামবাবুর খোট্টা চাপরাসীটা পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, আরে ভলুকো তো বহত লড়াই করে রে, দেখে তেরা কেমন ভালুকো।—বলিতে বলিতে সে খাঁ করিয়া ভালুকটাকে বেশ কায়দা করিয়া জাপটাইয়া ধরিল। অতর্কিত আক্রমণে ভালুকটা বেকায়দায় নীচে পড়িয়া গেল।

বাজিকর চটিয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল, ই কী করন তোমার সিংজী? বলেহার বেটা, বলেহার বেটা ভালুক রে।

ভালুকটা নিজের অসতর্ক অবস্থা তখন অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে। চারিদিকে দর্শক জমিয়া গিয়াছিল। সম্মুখেই দাঁড়াইয়া পার্বতী আর মদন যুধ্যমান ভালুক ও চাপরাসীটার প্যাঁচ-কষাকষির সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন দেহ লইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিতেছিল, কখনও দাঁতে ঠোঁটে কামড়াইয়া বলিতেছিল, দে—দে—দে!

শুধু মদন আর পার্বতী নয়, ওরূপ ধারায় মুখভঙ্গি করিতেছিল আরও অনেকে, মায় শ্যামগোপালবাবু পর্যন্ত। ভালুকটা যখন চাপরাসীটাকে চিত করিয়া ফেলিয়া দিল তখন তিনি ধনুকের মতো বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দর্শকরা হাসিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় হনুমানটা চট করিয়া উঠিয়া পরাজিত চাপরাসীটার মুখের উপর বাঁ পায়ের একটা মৃদু লাথি মারিয়া নিয়া দর্শকদের একবার দাঁত দেখাইয়া দিল। দর্শকের মধ্যে হাসির একটা হাঁড়ি যেন সশব্দে ফাটিয়া পড়িল। পার্বতী পথের উত্তপ্ত ধুলার উপরেই একটা ডিগবাজি মারিয়া দিল।

চাপরাসীটা অপমানে চটিয়া উঠিয়াছিল, শ্যামবাবুও চটিয়াছিলেন; কিন্তু এতগুলি লোকের সহানুভূতির বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। শুধু গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিলেন, হনুমান সেজেছে ওর নাম কি রে? কানে ধর তো বেটার, এই চৌকিদার!

ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল, আসছে'বারে ভোট দোব না কিন্তু!

অত্যন্ত রুষ্টকণ্ঠে শ্যামবাবু কহিলেন, কে?

বক্তা আসিয়া সম্মুখে জোড়হাতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, প্রভু, আমি।

শ্যামবাবু ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, বক্তা তাঁহার এক আত্মীয় এবং বন্ধু— হবুকাকা!

শ্যামবাবু কহিলেন, এস, এস তামাক খাও খুড়ো!

হবুকাকা বলিলেন, যা যা সব, যা এখন!

সঙের দল চলিয়া গেল। সমস্ত গ্রামখানা ঘুরিয়া বাজিকর যখন শিবতলায় ফিরিল তখন বেলা প্রায় চারিটা। দর্শকদলের বেশি কেহ আর তখন সঙ্গে ছিল না, শুধু পার্বতী তখনও পিছন ছাড়ে নাই। গাজনের পাণ্ডা হরিলাল পাত্র দাওয়ায় দাঁড়াইয়া ছিল, বিরক্তিভরে সে বলিল, ওঃ, আমোদ তোদের আর শেষই হয় না! নে বাপু, নৈবিদ্যি নিয়ে যা।

সঙ্গে সঙ্গে হনুমান ভালুক বাজিকর এক-এক গামছা খুলিয়া বসিল। হরিলাল সের খানেক করিয়া চাল, কয়টা কলা ও সামান্য কয়েকখানা বাতাসা বিতরণ করিয়া দিয়া বলিল, এইবারে আমি খালাস বাবা!

পার্বতী আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল, সে আরও আশ্চর্য হইয়া গেল, যখন বাজিকর জানোয়ার দুইটাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। হনুমানটাও এক দিকে চলিয়া গেল, ভালুকটাও পাশের গ্রামের পথ ধরিল। ভয়ে সে দূরত্ব একটু বাড়াইয়া দিয়া নাচিতে নাচিতে ভালুকটার পিছন ধরিল।

খানিকটা মাঠ পার হইয়াই 'মোলকিনী' পুকুর, ভালুকটা পুকুরের ঘাটে নামিয়া বসিল, তারপর হাত পা মুখ ও দেহ হইতে একে একে খোলসগুলি ছাড়াইতে আরম্ভ করিল।

পার্বতীর আমোদের সীমা-পরিসীমা ছিল না,—তাহার অনুমানই সত্য হইয়াছে। সে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, মানুষই বটে, মানুষই বটে, ওরে বাবা রে!

শব্দ শুনিয়া ভালুক তাহার দিকে চাহিয়া পরমানন্দে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছিল। কিন্তু সে কী ভীষণ মূর্তি! হাঁড়ির মতো প্রকাণ্ড মাথা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, আলকাতরার মতো কালো রং, নাকটা থ্যাবড়া, চোখ দুইটা আমড়ার আঁটির মতো গোল এবং মোটা, দুই গালের থলথলে মাংস খানিকটা করিয়া চোয়ালের নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মুখগহ্বরের পরিধি আকর্ণবিস্তৃত। সেই মুখগহ্বর মেলিয়া বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া সে হাসিতেছিল, দেখিয়া পার্বতী সভয়ে ছুটিয়া পলাইল। ভালুক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, ও খোকাবাবু, ও খোকাবাবু!

পার্বতী একবার দাঁড়াইয়া ফিরিয়া চাহিল। ভয় অপেক্ষা বিস্ময়ের মাত্রা তাহার অনেক গুণ অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। এত লম্বা এত মোটা আর এত কালো লোক

সে কখনও দেখে নাই। সমস্ত গা বাহিয়া কালো আঠার মতো কী ঝরিতেছে! বুকও গুরগুর করিতেছিল, ভালুক না ভূত! না, তার চেয়েও বেশি মেলে গয়লাদের কাদামাখা মহিষগুলার সঙ্গে! লোকটা একখানা বাতাসা হাতে তুলিয়া তখনও তেমনই হাসিতে হাসিতে ডাকিতেছিল, পেসাদ, পেসাদ, শিবের পেসাদ!

পার্বতী সভয়ে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল, ভালুকের কথা শুনিয়া সে দুই পা পিছাইয়া গেল। ভালুক এবার কয় পা তাহার দিকে আগাইয়া আসিয়া আরও খানিকটা বেশি হাসিয়া বলিল, ভয় কী খোকাবাবু, এস!

পার্বতী নিমেষের মধ্যে পিছন ফিরিয়া ছুটিল এবং পথপার্শ্বের জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভালুক হাসিতে হাসিতে ঘাটে ফিরিয়া নৈবেদ্যের পুঁটুলিটা খুলিয়া বসিল। সবসুদ্ধ গামছাটা জলে ভিজাইয়া লইয়া চাল কলা ও বাতাসায় মাখিয়া প্রকাণ্ড বড় বড় গ্রাসে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ করিয়া ফেলিল। উচ্ছিষ্টলোভী কয়টা কাক দূরে বসিয়া ছিল, শূন্য গামছাখানা সে বারকয়েক তাহাদের দিকে সজোরে ঝাড়িয়া দিয়া বলিল, ওই লে, ওই লে! তারপর গামছাখানা জলে কাচিয়া লইয়া ভালুকের পোশাক ঘাড়ে ফেলিয়া সে পথ ধরিল। ডোম-পাড়ায় পৌঁছিয়া একটা বাড়িতে ঢুকিয়া, ডাকিল, ভোবন, আজ যে মজা, বুঝলি কিনা!

'ভোবন' অর্থাৎ ভুবনমোহিনী ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, জ্বালাস না আমাকে আর, আপন জ্বালাতে বলে মলাম আমি। ভাতের হাঁড়িটা নামা দেখি!

ভুবনমোহিনী ওই লোকটিরই যেন ছায়া বা দর্পণের মধ্যের নারীরূপিণী প্রতিবিম্ব। অমনই কালো, অমনই দৈর্ঘ্যে, অমনই পরিধিতে! মাথার সম্মুখেই সিঁথি জুড়িয়া একটা টাক, প্রকাণ্ড বড় মুখের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র দুইটা চোখ, লম্বা নাক, তাহার উপর উপরের ঠোঁটের এক পাশের খানিকটা মাংস নাই, সেদিক দিয়া দুইটা দাঁত নীচের ঠোঁটের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে।

ভালুকের পোশাকটা ঘাড় হইতে ফেলিয়া পুরুষটি ভাতের হাঁড়ি নামাইতে চলিল।

ভুবন বলিল, আমার মাথা বলে খসে গেল! ওষুদ নাই, পত্তর নাই, আর বাঁচব না আমি!—ও মা!

পুরুষটি কোনো উত্তর দিল না, কোথা হইতে একটা পোড়া বিড়ি বাহির করিয়া উনানের আগুনে সেটাকে ধরাইতে বসিল। ভুবন তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল, তু ঘরে বসে থাকবি কেনে, বল? একা মেয়েমানুষ আমি, কত রোজকার করব?

ভালুক নিজের কনুইটা দেখিতে দেখিতে বলিল, তাই বলি জ্বলছে কেনে! মাস ছেড়ে গিয়েছে দলকাছাড়া হয়ে।

তারপর ভুবনের দিকে চাহিয়া বলিল, বাবুদের ওই খোট্টা চাপরাসী, বেটা আচমকা আমাকে চেপে ধরে কায়দা করে ফেলিয়েছিল আর টুক্‌চে হলে!

ভুবন বলিল, ত্যাল লাগা খানিক।—বলিয়াই সে মাটির উপর শুইয়া পড়িল, আঃ, গা-গতর যেন ঢিঁকিতে কুটছে!—বাবা!

ভালুকের কথা তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতেছিল, তেমনই দিয়েছি বেটাকে ঠিক করে। আমাকে পারবে কেনে বেটা, আমার ক্ষ্যামতায় আর—

মুখের কথা কাড়িয়া ভুবন বলিল, তাই তো বলছি, ওই ক্ষ্যামতায় খাটলে যে রোজকার হয়! আচ্ছা, কেন খাটিস না, বল দেখি।

ভালুক বলিল, উ গাঁয়ে একটি কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলে, বুঝলি ভোবন!

ভুবন ভুলিল না, সে বাধা দিয়া বলিল, তোর ভাত আমি যোগাতে পারি? খাটুনিকে এত ভয় কিসের তোর?

ভয় আবার কী?

তবে?

নিজের বিশাল দেহের দিকে চাহিয়া ভালুক কহিল, খাটতে গেলে গতর দেখে সব। বলে, গতর দেখ আর খাটছে দেখ। খুঁড়ে খুঁড়ে আমার গতর কমে গেল। উঁহুঁ, উ-সব হবে না। দত্তকাকা বলেছে, কলকাতার যাত্রার দলে ঢুকিয়ে দেবে আমাকে।

এ কথা ভুবনের বহুবার শোনা কথা। বহু কাণ্ড এই লইয়া হইয়া গিয়াছে, ভুবন চুপ করিল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ যেন তাহার কী মনে পড়িয়া গেল, সে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সং সাজলি, তার পয়সা কই, লৈবিত্তি কই?

ভালুক বলিল, পয়সা এখনও ভাগা হয় নাই।

লৈবিত্তি? বলি, লৈবিত্তি কী হল?

ভালুক ডাকিল, আয় আয় গোবরা, আয়!

গোবরা এক বিশালকায় কুকুর, এ পরিবারটির উপযুক্ত জীব। শুধু গোবরা নয়, গোবর গণেশ উহার নাম। খায় দায় ঘুমায়, চোর আসুক ডাকাত আসুক—কোনো আপত্তি নাই তাহার, সে কাহাকেও কিছু বলে না।

ভুবন সরোষে বলিল, বলি, লৈবিত্তি কী হল?

খেয়ে দিয়েছি। যে খিদে, বাবাঃ!

ভুবন আবার শুইয়া পড়িয়া কাতরাইতে লাগিল। ভালুক ভাতের হাঁড়িটা

নামাইয়া ফেলিয়া বলিল, আজ আর খিদে বেশ নাই। লৈবিষ্টি খেয়ে খিদে পড়ে গেল।

ভুবন বলিল, আমি টাকা দোব, তু গোরু কেন একজোড়া, ভাগে চাষ—

ভালুক মধ্যপথেই ভুবনকে বাধা দিয়া বলিল, ধেৎ! টাকা টাকা করেই মরবি তু। ছেলে নাই, পিলে নাই, দুটো পেট শুধু; বেশ তো চলছে!

ভুবন বলিল, হা রে মুখপোড়া গাঁদা মোষ, বলি—খেটে খেটে যে আমার গতর পড়ে গেল!

ভালুক হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তোর গতরের এক শরষেও কমে নি, ভোবন। দাঁড়া, একখানা বড় আরশি এনে দোব তোকে। একটা টাকা দিস দেকি নি!

হাতের কাছেই পড়িয়া ছিল একটা শুকনা গাছের ডাল, ভুবন স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সজোরে সেটাকে ছুঁড়িয়া মারিল। ভালুক কিন্তু ভুবনের মতলব পূর্বেই বুঝিয়াছিল, সে একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। ডালটা বোঁ শব্দে ডাক ছাড়িয়া উঠানের পেয়ারাগাছে প্রতিহত হইল।

ভালুক হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতেই বলিল, ওইটো যদি লাগত, ভোবন! শেষে তো তোকেই ত্যাল মালিশ করতে হত।

ভুবন বলিল, ওই ছিরিতে আর দাঁত বার করে হাসিস নে বাপু। আহা-হা!

ভালুক হা-হা করিয়া হাসিয়া ঘরখানা ভরাইয়া দিল।

ভুবনও না হাসিয়া পারিল না, সেও সলজ্জভাবে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

কথাটা পুরাতন দিনের কথা।

ভালুকের নাম মতিলাল, জাতিতে সে হাড়ি। এ গ্রামের বাসিন্দা তাহারা নয়; এখান হইতে ক্রোশ পাঁচেক দূরে তাহার পৈতৃক বাস। এ গ্রামে তাহার মাতুলালয়, নিঃসন্তান মাতুলের ভিটায় সে ভুবনকে লইয়া বৎসরখানেক আসিয়া বাস করিতেছে।

ভুবন কিন্তু এই গ্রামের মেয়ে। তাহাদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী ভুবনের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় প্রথম বিবাহ হয়। তখন তাহার ঠোঁটের পাশটা কাটা ছিল না।

বৎসর দশেক বয়সের সময় গাছে গাছে ‘ঝাল্লু’ খেলিতে গিয়া ঠোঁট কাটিয়া দাঁত বাহির হইয়া গেল। তখন সে ছিল লম্বা, কিন্তু ছিপছিপে পাতলা। এগারো বৎসর বয়স হইতেই দেহে তার জোয়ার ধরিতে আরম্ভ হইল। তখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর। সেবার জামাইষষ্ঠীতে বাপ তাহার জামাই লইয়া আসিল। জামাইটি দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, সচরাচর নিম্নশ্রেণীর জোয়ান যেমন হইয়া থাকে তেমনই। শাশুড়ী

জামাইকে পরমাদরে বসাইয়া পা ধুইতে এক ঘটি জল নামাইয়া দিল। ভুবনের বাপ গিয়াছিল মাছের সন্ধানে। মা-ও তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল তেলের বোতল হাতে, —ভুবনের চুলটা বাঁধিয়া দিতে হইবে। ছেলেটি পা না ধুইয়া এদিক-ওদিক চাহিতেছিল ভুবনের সন্ধানে। ঠিক এই সময়টিতেই ভুবন আসিয়া বাড়ি ঢুকিল। কাঁধে এক প্রকাণ্ড বড় কলসী। গ্রাম হইতে মাইলখানেক দূরে ঝরনার জল আনিতে গিয়াছিল সে।

বাড়ি ঢুকিয়াই সে স্বামীকে প্রশ্ন করিল, কে বটিস রে তু, কোথা বাড়ি?

বাপের ফিরিবার কথা ছিল সন্ধ্যায়; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহারা দ্বিপ্রহরের পূর্বেই আসিয়া পড়িয়াছে। ভুবনের স্বামী অবাক হইয়া বিপুলকায়া ভুবনের কুৎসিত মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

ভুবন আবার প্রশ্ন করিল, রা করিস না কেনে রে ছোঁড়া, কোথা বাড়ি তোর?

তেলের বোতল হাতে মা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, মাথায় কাপড় দে হারামজাদী, জামাই রয়েছে!

দারুণ লজ্জায় সহাস্যে পুরু জিবটা এতখানি বাহির করিয়া ভুবন দুমদুম শব্দে দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। মাও তাহার পিছন পিছন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, চুল বেঁধে দি তোর আগে। ও বাবা কানাই, হাতমুখ ধোও বাবা, শ্বশুর তোমার আইচে বলে।

অল্প কিছুক্ষণ পর ভুবনের বাপ মাছ হাতে বাড়ি ঢুকিয়া বলিল, কই, কোথা গেলি গো? কানাই কোথা গেল?

শাশুড়ী বাহিরে আসিয়া বলিল, এই হেথাই তো।

কানাই, অ বাবা!

কেহ কোথাও ছিল না, জলের ঘটিটা পর্যন্ত তেমনই পূর্ণ অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া আছে। ধূলা পায়েই কানাই পলাইয়াছে।

সে আর আসে নাই, আবার সে বিবাহ করিয়াছে।

তাহার পর কত সম্বন্ধ যে ভুবনের বাপ করিল, তাহার হিসাব নাই। কিন্তু ভুবনকে দেখিয়া সকলেই একরূপ পলাইয়া গেল।

ভুবনকে দেখিলেই পাড়ার ছেলেরা ফিক করিয়া হাসিত। ভুবন সে ব্যঙ্গ হাসির জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিত। একদিন ক্রোধে আপনার কপালে নোড়ার ঘা মারিয়া রক্তে মুখ ভাসাইয়া ফেলিল।

মামার অসুখের সংবাদ পাইয়া মতিলাল সেদিন এই গ্রামে আসিয়াছিল। তখন তাঁহার তিনটি বিবাহ হইয়া গেছে, কিন্তু গৃহ গৃহিণীশূন্য। গ্রামে ঢুকিবার পথেই ভুবনের

সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। তাহার রূপের কারুকার্য দেখিয়া মতিলাল না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

ভুবন ঘৃণার সহিত বলিল, ওই ছিরিতে আর দাঁত বার করে হাসিস নে বাপু! আ হা হা!

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহার কয়েক দিন পরই ভুবনের সহিত মতিলালের বিবাহ হইয়া গেল। মতিলাল ভুবনকে লইয়া ধুমধামের সহিত আপনার ভিটায় গিয়া সংসার পাতিয়া বসিল। প্রথম দিনই সন্ধ্যায় সে ভুবনকে ডাকিয়া বলিল, শোন, একটা কথা বলি!

সে আসিয়া বলিল, কী?

বোস, একটা জিনিস এনেছি, দেখ! তোকে কেমন সোন্দর করে দি, দেখ!

মতিলাল খানিকটা খড়ির মতো সাদা গুঁড়া জলে গুলিতে বসিল। ভুবন আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, উ-কী?

মতিলাল অহঙ্কার ভরে বলিল, যাত্রায় সব মুখে মাখে দেখিস নাই? কালো কুচ্ছিতও এতে সোন্দর হয়!—বলিয়া সে ভুবনকে রং মাখাইতে বসিল। তারপর আয়না মুখের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, দেখ!

ভুবন তাহার হাত হইতে আয়নাখানা টানিয়া লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে বসিল। তারপর সহসা আয়নাখানা রাখিয়া দিয়া বলিল, আয় তোকে মাখিয়ে দি আমি!

গম্ভীরভাবে মতিলাল বলিল, উঁহু, তু পারবি না। ই সব ভাগমাপ শিখতে হয়। দে, আমি মাখি!—বলিয়া নিজেই রং মাখিতে বসিল।

ভুবন কিন্তু অভিমান করিল। সেটুকু আবিষ্কার করিয়া মতিলাল বলিল, তোকে শিখিয়ে দোব, তু একদিন মাখিয়ে দিস!

ভুবন বলিল, তু কোথায় শিখেছিস, শুনি?

মতিলাল হাসিয়া বলিল, যাত্রার দলে শিখেছি। তা ছাড়া আমি কত রকম সাজতে পারি বলে! দেখবি?

সে তাহার একটা ঝাঁপি খুলিয়া বাহির করিল, বস্তার তৈয়ারি ভালুকের খোলস, পেত্নী সাজিবার ছেঁড়া কাঁথা, আরও কত কি!

তাহার পর ক্রমশ ভুবন আবিষ্কার করিল, মতিলালের ওই পেশা। খাটুনির নাম নাই, খায় দায় ঘুমায়, যাত্রার দলের ভার বয়, তামাক সাজে, আর মাঝে মাঝে সং সাজিয়া বেড়ায়।

ভুবন কিন্তু দারুণ পরিশ্রমী মেয়ে, শরীরে শক্তি তাহার বিপুল; সে ধান ভানিয়া,

ঘুঁটে দিয়া, ঘাস বেচিয়া স্বচ্ছন্দ আহারের প্রাচুর্যে বিপুলকায় মতিলালকে আরও স্ফীত এবং কুৎসিত করিয়া তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও তাহাই হইয়া উঠিল। মতিলালকে সে অহরহ তিরস্কার করে রোজগারের জন্য। মতিলালের সেই এক উত্তর—খাটতে গেলে গতরে লজর দেয় সব, উ হবে না। যাত্রার দলে এবার মাইনে হবে। আর ছেলেপিলে হোক, তখন না হয়—! ছেলে না হলে কি ঘর!—বলিয়া সে পুলকে হি-হি করিয়া হাসে।

ভুবন বলিল, হবে তো ছেলেপিলে।

মতিলালের মনে পুলক বাড়িয়া গেল, দাঁড়া, আজ মাদুলি এনে দোব তোকে!

মাদুলি সে আনিয়াও দিল, একটা নয়, একটা একটা করিয়া পাঁচছয়টা মাদুলী ভুবনের বুকে এখন ঝোলে।

বেশ চলিতেছিল। কর্মপরায়ণা ভুবনের কর্মের মধ্যেই দিন কাটিয়া যাইত। সেদিন সহসা তাহার দৃষ্টিতে পড়িল, পুকুরের ধারে মতিলাল বসিয়া হি—হি করিয়া হাসিতেছে, আর যাত্রার দলের কয়েকটা ছেলে তাহাকে কাদা মাখাইতেছে। একজনের কথাও তাহার কানে আসিল, সে মতিলালকে বলিতেছিল, গাঙের পলি যদি মাখতে পারিস, তবে রং ফরসা হবে নিশ্চয়। এতেও হবে, তবে ফিট গোরা হবে না।

সে কথার দিকে মতিলালের মন ছিল না, সে দূরের কতকগুলো ছোট ছেলের কথা শুনিয়া হাসিতেছিল।

তাহারা হাততালি দিয়া নাচিতেছিল আর সুর করিয়া গাহিতেছিল, আয় রে কালো মোষ, কাদা মাখবি বোস!

ভুবনের অঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে মতিলালকেই ডাকিল, ও মুখপোড়া, বলি শোন!

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিল।

যাত্রার দলের একজন বলিল, মাধব তাঁতীর লীলেবতী।

ক্রোধে ভুবনের চোখে জল দেখা দিল, মতিলাল কিন্তু হাসিয়া বলিল, বলুক কেনে; তোরও যেমন!

ইহার পর ক্রমশ ভুবন আবিষ্কার করিল, এ কথা এ গ্রামের সকলেই বলে, কর্মের ব্যস্ততার মধ্যে ভুবন এতদিন শুনে নাই, বা শুনিতে পায় নাই। ভুবন জেদ করিয়া বসিল, সে থাকিবে না। মতিলাল বলিল, মামার ভিটে তো মোটে এইটুকু ছোট ঘর, ছেলেপিলে হলে কুলোবে কেন?

ভুবন বলিল, ঘর করে লিবি, অত বড় হাঁদা মুনিষ!

প্রবল আপত্তি করিয়া মতিলাল বলিল, উঁহু, সি আমি পারব না। বাবা, ঘর তোলা কি সোজা কথা!

ভুবন তবু মানিল না, সে বলিল, ঘরের খরচ আমি দোব। আর বাবা আছে, দাদা আছে!

বাধ্য হইয়া বৎসরখানেক পূর্বে মতিলাল মাতুলালয়ে আসিয়া বাস আরম্ভ করিল। ভুবনের চেষ্টায় ও অর্থে ঘর হইয়াছে। মতিলাল এখানকার পাঁচালির দলে এখন তামাক সাজে। দত্ত-কাকার দরবারে নিয়মিত হাজির দেয়, দত্ত-কাকা তাহাকে কলিকাতার যাত্রার দলে চাকরি করিয়া দিবেন। ভুবন যেমন খাটিত, তেমনই খাটে। তাহার পরিশ্রমে এখানেও স্বচ্ছন্দ সংসার, কোনো অভাব নাই। বলিতে ভুলিয়াছি, এখন ঘরের কাজ, ভাত রাঁধা, জল তোলা এগুলি মতিলালকেই করিতে হয়। বাড়িতে পা দিলেই ভুবনের শরীরে অসুখ দেখা দেয়।

ঐ চৈত্র-সংক্রান্তির দিনই।

মতিলাল রান্নাবান্না শেষ করিয়া স্নান করিয়া আসিল। দুইখানা গামলায় হাঁড়ির ভাত ঢালিয়া ডাকিল, ভোবন, ওঠ!

ভুবন উঠিয়া বসিল। মতিলালের গামলার দিকে চাহিয়া বলিল, এই যে বললি খিদে নাই আজ! চারটি ভিজিয়ে রাখলে কালকের মুড়ি আসান হত।

থাবা ভরিয়া গ্রাস তুলিতে তুলিতে মতিলাল বলিল, আবার লেগেছে খিদে।

ভুবন বলিল, তোর ওই কুকুরের ভাত আমার হেনসেল থেকে দোব না, আজ তোর ভাত থেকে তু দে। লইলে লৈবিদ্যি আন।

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, দেখবি, রেতে চেঁচাবে খিদেতে, ঘুম হবে না তোর।

ভুবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের দৃষ্টিতে যেন অগ্নি বর্ষণ করিয়া বলিল, নেতার মেরে দোব তা হলে আজ ওর।

মতিলাল, সকাতর কণ্ঠে বলিল, আহা-হা ভোবন, কেষ্টের জীব! আর জানিস, তোর যখন ছেলে হবে, তখন দেখবি কত কাজ করে গোবরা!

ভুবন উষ্মাভরেই কহিল, কী করবে কী শুনি?

এই ছেলে শুয়ে থাকবে, গোবরা পাহারা দেবে, কাক তাড়াবে।

সত্য, গোবরগণেশের ওই গুণটি আছে, বাড়িতে কাক নামিতে দেয় না। ভুবন শুধু বলিল, হুঁ।

মতিলালের দৃষ্টিতে পড়িল, পার্বতী ও মদন দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া উঁকিঝুঁকি

মারিতেছে। সে গাল ভরিয়া হাসিয়া বলিল, এই দেখ ভোবন, এই ছেলেটির কথা বলেছেলাম।

পার্বতী মদনকে বলিতেছিল, ওই দেখ!

ভুবন মুখ ফিরাইয়া তাহাদের দেখিয়া বলিল, এস খোকাবাবুরা, প্যায়রা আছে দোব, বস!

ওরে বাবা রে, ধরবে ভাই!—বলিয়া মদন ছুটিয়া পলাইল।

পার্বতী তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। মতিলাল বলিল, প্যায়রা খাবে এস খোকাবাবু! যাবার সময় আমি হাতী সেজে পিঠে করে দিয়ে আসব তোমাকে।—বলিয়াই সে মাটিতে হাত পাড়িয়া চতুষ্পদ সাজিয়া পার্বতীকে দেখাইল।

মদন পিছন হইতে ডাকিল, পালিয়ে আয় রে, ধরবে! পার্বতী আর থাকিতে সাহস করিল না, পলাইল।

পরদিন কিন্তু সকালেই তাহারা আসিয়া হাজির। ঢেঁকিশালে ভুবন দুমদুম শব্দে ধান ভানিতেছিল। মতিলাল দাওয়ায় বসিয়া মুড়ি খাইতেছিল।

দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া পার্বতী বলিল, ভালুক, প্যায়রা দিবি?

মুখে একমুখ মুড়িসুদ্ধই মতিলাল দাঁত বাহির করিয়া বলিল, এস এস, খোকাবাবু এস!

মদন বলিল, ওখান থেকে ছুঁড়ে দে। তুই ভূত! সে রাক্কুসী কই, সেই দাঁত বার করে?—বলিয়াই সে দাঁত বাহির করিয়া দেখাইয়া দিল।

মতিলাল হা-হা করিয়া হাসিয়াই সারা হইল।

কে রে, খালভরা ছেলে!—ভুবন ঢেঁকিশাল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

পার্বতী ও মদন ছুটিয়া পলাইল। ভুবন আপন মনেই বকিতেছিল, ভদ্দনোকের ছেলে, ভদ্দনোক সব, বাক্যি দেখ দেখি! ভূত, রাক্কুসী। অঃ!

মতিলাল তখন সবলে পেয়ারাগাছটাকে নাড়া দিতেছিল। সে হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, তুও যেমন ভোবন, বলুক কেনে!

ভুবন ঝঙ্কার দিয়া বলিল, না বলবে কেনে, কিসের লেগে? ছেলের কথা দেখ দিকিনি!

গ্রামের ধারে দাঁড়াইয়া মদন তখন পার্বতীকে বলিতেছিল, না, যাস নি ভাই, শুনিস নি রাক্কুসীর গল্প? ওরা ঠিক ভূত আর রাক্কুসী—মানুষ সেজে আছে।

খোকাবাবু, ও খোকাবাবু, প্যায়রা নিয়ে যাও!—আঁচলে করিয়া পেয়ারা লইয়া মতিলাল হাসিতে হাসিতে তাহাদের ডাকিতেছিল।

মদন বলিল, ওইখানে ঢেলে দে! তুই সরে যা!

মতিলাল হাসিয়া পেয়ারাগুলি ঢালিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

পেয়ারাগুলি তুলিয়া লইয়া পার্বতী বলিল, ভালুক হয়ে যা দেখি, সেই কালকের মতো!

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, দাঁড়াও তোমরা, আসছি আমি।

কয়েক মিনিট পরেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনিয়া পেয়ারা খাইতে খাইতে ব্যস্ত মদন ও পার্বতী দেখিল, ভালুক আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মদন প্রচণ্ডবেগে ছুটিল। পার্বতীও তাহার অনুসরণ করিল। ভালুক উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, অ খোকাবাবু!

ছেলে দুইটির সঙ্গে মতিলালের একটু আত্মীয়তা হইল, কিন্তু আত্মীয়তা নিবিড় হইল না। তাহারা পেয়ারার জন্য রোজ আসে, কিন্তু মতিলালকে ধরা দিল না।

মতিলাল হাসিমুখে ডাকে, তাহারা খানিকটা সরিয়া গিয়া বলে, না।

মতিলাল তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে, কত সাজতে পারি আমি, তোমাদিগে দেখাব।

মদন বলে, ছাই। বস্তা গায়ে দিয়ে!—ভালুকের রোঁয়া নেই, যাঃ! পার্বতী বলে, ভূত সাজতে পার?

হাসিতে হাসিতে মতিলাল বলে, হুঁ। দুধ খাও তো, না খেলে আমি ভূত সেজে ধরব।

কই, সাজ দেখি ভূত!

সেই ধরমপুজোর সময় —আর দেরি নাই।

বাঘ সাজতে পার?

হুঁ।

সব সাজতে পার?

হুঁ।

ভীত অথচ মুগ্ধ-বিস্ময়ে ছেলে দুইটি মতিলালের দিকে চাহিয়া থাকে।

মতিলাল ডাকে, শোন শোন, একটা কথা বলি। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই আগাইয়া আসে। ছেলে দুইটি সভয়ে ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

ভুবন বলে, তোর যেমন আদিখ্যেতা! উ কি তোর স্বভাব?

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া বলে, ওরা ভয় করে, আমার ভারি ভালো লাগে ভোবন। আমি আবার বলি কি জানিস, দুধ খাও তো, না খেলে আমি ধরব। একদিন পেত্নী সাজব, দাঁড়া।

ভুবন বলিল, ভূত তো সেজেই আছিস, আর পেত্নী সাজতে হবে না বাপু, থাম।

মতিলালের হাসি আর থামিতে চায় না।

রাঢ় দেশ। বৈশাখ মাসে বুদ্ধ-পূর্ণিমায় ধর্মরাজের পূজা, নিম্নজাতির এক বিরাট উৎসব। মতিলালের গ্রামে, মহুগ্রামে ধর্মরাজের পূজার উৎসবে প্রচুর ধুমধাম হয়। মহুগ্রামের ধর্মদেবতা নাকি ভারি জাগ্রত। চার-পাঁচখানা গ্রামের নিম্নজাতির সকলেই এই ধর্মরাজের পূজা-অর্চনা করে। এবার উৎসবের আড়ম্বর খুব বেশি। পাশের বর্ধিষ্ণু গ্রামে স্বর্ণকাররা পাল্লা দিয়া নাকি উৎসব করিবে! এবার ঢাক আসিল ত্রিশটা। মহুগ্রামে বরাদ্দ হইয়াছে পঁয়ত্রিশটা। সংবাদটা কিন্তু গোপন রাখা হইয়াছে। ওগ্রামের ভক্তের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ পূর্ণ করিবার জন্য খুব চেষ্টা হইতেছে। মহুগ্রামের ভক্তের সংখ্যা ষাট ছাড়াইয়া গেছে।

চুলওয়ালা দত্ত-খুড়োর সঙ্গে মতিলাল মহা উৎসাহে তদ্বির-তদারক করিতেছিল। দত্ত-খুড়ো বলিল, তুইও একজন ভক্ত হলি না কেন মতিলাল ?

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, উপোস করতে লারব খুড়োমশায়। উ হবে না।

দত্ত-খুড়ো হাসিয়া বলিলেন, পেটটি না ভরলে মতিলালের আমার চলবে না, না কি বল মতিলাল ?

মতিলাল হাসিয়া বলিল, ভোবন কি বললে জান? বললে, প্যাটে ছুরি মার তু!

দত্ত বলিল, তা বেশ। তোকে কিন্তু ইদিকের কাজ ডাক-হাঁক সব করতে হবে। বোলানের দল সব আনতে হবে। আর, সং এবার কিন্তু খুব আচ্ছা বঁঢ়িয়া রকমের হওয়া চাই।

মতিলাল একমুখ হাসিয়া বলিল, পাঁচ জুতো খাব উ গাঁকে হারাতে না পারি তো।

সার্ধ দুই সহস্র বৎসরেরও পূর্বে যে তিথিতে অর্ধ জগতের ধর্মগুরু মহামানব বুদ্ধ সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া স্নানান্তে মরণ-পণে তপস্যায় বসিয়াছিলেন, সেই পূর্ণিমার ঠিক প্রথম লগ্নে উৎসবের প্রারম্ভ। সেই দিন হয়—মুক্তিস্নান।

দলে দলে ভক্তরা 'মুক্তচান' করিয়া উত্তরী পরিতেছিল। ঢাকের বাজনায় সচকিত পাখির দল কলরব করিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, কোনো স্থানে বসিতে তাহাদের সাহসই ছিল না। হনুমানের দলও দ্রুতবেগে বিপুল শব্দ করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতেছিল।

মতিলাল আপনার সঙের পোশাকের থলি বাহির করিয়া বসিয়া ছিল, দুই টুকরা সোলাকে সে ধারালো ছুরি দিয়া চাঁচিতেছিল।

ভুবন বলিল, আ মরণ তোর, দেশের লোক গেল মুক্তচান দেখতে, আর পেটুক রাক্ষসের কাজ দেখ!

সাদা সোলা দুই টুকরা দুই গালে দুই দিকে পুরিয়া মতিলাল হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিল, ধঁরব, খাঁব তোঁকে!

ভুবনও দুই পা সরিয়া গিয়া বলিল, এই দেখ, ভালো হবে না বলছি!

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভুবন বলিল, দেখ দেখি, মানুষকে ভয় লাগিয়ে দেয়! খোল বাপু, তোর দাঁত খোল!

মতিলাল পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রশ্ন করিল, তোরও ভয় লাগল ভোবন?

ভুবন বলিল, হ্যাঁ, ভয় লাগতে আমার দায়! কিন্তু তু যে বললি ধম্মরাজের মাদুলি এনে দিবি?

ট্যাঁক হইতে খুলিয়া মাদুলি বাহির করিয়া দিয়া মতিলাল বলিল, একটো পাঁঠা কিনে রাখতে হবে আবার। ছেলে হলে পাঁঠা লাগবে—দেবাংশী বলেছে।

পরদিন পূর্ণিমার অবসান-সময়ে ব্রতের উদযাপন। ঢাক শিঙা কাঁসি কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ বাজাইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইল। প্রথমেই একদল ঢাক ও বাদ্যভাণ্ড, তাহার পরেই শ্রেণীবদ্ধভাবে বারো-চৌদ্দ সারি ভক্তের দল ভাঁড়াল মাথায় করিয়া চলিয়াছে। ভাঁড়াল এক-একটি জলপূর্ণ মঙ্গল-কলস, কলসগুলির গলায় ফুলের মালা; ভক্তের দলেরও প্রত্যেকের গলায় মোটা মোটা কল্কে আউচ ও গুলঞ্চ ফুলের মালা। ভক্তদলের চারিপাশে সারি সারি ধুপদানি হইতে ধুপের ধোঁয়া উঠিতেছে। তাহারা ঢাকের বাজনার তালে তালে ভক্ত-নাচ নাচিয়া চলিয়াছে। আবার পিছনে একদল ঢাক। তাহার পিছনে দশখানা গ্রামের নিম্নশ্রেণীর নরনারী কাতারে কাতারে চলিয়াছে।

মহুগ্রামের ভাঁড়াল আসিয়া বর্ধিষ্ণু গ্রামখানায় প্রবেশ করিল। মহুগ্রাম এই গ্রামের বাবুদেরই জমিদারি, চিরকাল ভাঁড়াল এ গ্রামে আসে। রাস্তার দুই পাশের ঘরের দাওয়া ভদ্র নরনারীতে পরিপূর্ণ। ভাঁড়ালের দলের ভক্তদের সঙ্গে তালে তালে তাহাদেরই মত নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে কত ছেলে, তাহার মধ্যে অগ্রবর্তী পার্বতী ও মদন।

আপনাদের দাওয়া হইতে পার্বতীর মা ডাকিল, ওরে ও হতভাগা, উঠে আয়! এই বোশেখ মাসের দুপুরে রোদ—উঠে আয়!

পার্বতী নাচিতে নাচিতেই মাকে এক ভেংচি কাটিয়া দিল।

সমস্ত দলের পিছনে একখানা ঢাকের বাদ্যধ্বনি অকস্মাৎ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ার্ত কলরব। পিছনের দিক হইতে ভিড় ভাঙিয়া চতুর্দিকে সব ছুটিয়া পলাইতেছিল। বামনবুড়ী গুল্‌পী মাত্র হাত দুই লম্বা, সে পলাইতে না পারিয়া একটা বাড়ির দেওয়ালে মুখ গুঁজিয়া মুদিত চোখে কাঠের মতো লাগিয়া গেল।

ভয়েরই কথা! ঢাকের সম্মুখে তালে তালে নাচিতে নাচিতে আসিতেছিল—বিকট এক মূর্তি! মাথায় এক আঁটি খড়ে কালো রং মাখাইয়া পরচুলা পরিয়াছে, বিকটাকার মুখে দুই গালের পাশে গজদন্তের মতো দুই দাঁত, রাজ্যের ছেঁড়া কাঁথা পরা, জানু পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে দুই স্তন, সর্বোপরি ভয়াল তাহার দুই হাত—প্রত্যেকটি চার-পাঁচ হাত করিয়া লম্বা। এক হাতে এক ঝাঁটা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভক্তদল ও বাদ্যভাণ্ড ছাড়া রাস্তা পরিষ্কার হইয়া গেল। মদন যে কোথায় পলাইল, তাহার সন্ধান পার্বতী পাইল না। সে ছুটিয়া আসিয়া লুকাইল মায়ের পিছনে।

মাও ভয় পাইয়াছিল, তবু সে বলিল, যাবি, যাবি আর? ডাকব ঝাঁটাবুড়ীকে? শোন শোন, ও ঝাঁটাবুড়ী!

ঝাঁটাবুড়ী ঘুরিয়া দাঁড়াইল। পার্বতীকে ঠেলিয়া সম্মুখে আনিয়া মা বলিল, এই দেখ, রাস্তায় পেলেই ধরবি একে।

ঝাঁটাবুড়ী পরমানন্দে নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে বিচিত্র নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল সেইখানে।

হারুবাবুর মা খপ করিয়া পার্বতীর চোখ ও কপাল আবৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, পালাও, তুমি পালাও!

নাচিতে নাচিতে ঝাঁটাবুড়ী চলিয়া গেল।

হারুবাবুর মা তখন বলিতেছিলেন, জল—জল—পাখা—পাখা!

মতিলাল বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে বকশিশ পাইল দুই টাকা। বাবু ভারি খুশি হইয়াছিলেন। তিনি নিজে ভয়ে বু-বু করিয়া উঠিয়াছিলেন।

বাড়িতে সে তখন পোশাক ছাড়িতেছে, দত্ত-খুড়ো বাড়ি পর্যন্ত আসিয়া তারিফ করিয়া বলিলেন, খুব ভালো হয়েছে মতিলাল!

সবিনয়ে মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিল শুধু।

দত্ত বলিল, বামন গুল্‌পী বুড়ী থাকতে থাকতে ধপাস করে পড়ে গেল। মুখুজ্জেদের পার্বতীর চেতন করাতে তো ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। আর বাঁড়ুজ্জে কর্তা তো—

চমকিয়া উঠিয়া মতিলাল প্রশ্ন করিল, পার্বতীর চেতন হইছে ?

দত্ত বলিল, হাঁ, তবে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। ওর মায়ের যেমন—

পোশাক-পরিচ্ছদ সব পড়িয়া রহিল, মতিলাল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া পেয়ারার গাছ ঝরাইয়া এক কোঁচড় পেয়ারা লইয়া সে বাহির হইয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়া কতকগুলা কি লইয়া চলিয়া গেল।

পার্বতী শুইয়া ছিল, তাহার মা শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছিল। বাপ ফুলু মুখুজ্জে ক্রমাগত আপন মনে তিরস্কার করিতেছিল পত্নীকে, হুঁঃ, আক্কেল দেখ দেখি, হুঁঃ— !

বাহির হইতে কে ডাকিল, বাবু !

কে ?—ফুলু মুখুজ্জে বাহিরে আসিয়া আঁতকাইয়া ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাহির হইতে সাড়া আসিল, আজ্ঞে ভয় নাই, আমি মতিলাল। খোকাবাবুকে ডেকে দেন, ভালুক সেজে এসেছি আমি, ভালুক দেখলে তার ভয় ভেঙে যাবে।

দরজা খুলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মতিলালের মাথায় পড়িল এক লাঠি। লাঠি মারিয়া মুখুজ্জে বলিল, বেরো শালা, বেরো !

এক লাঠিতে মতিলালের কিছু হইবার কথা নয়, হয়ও নাই ; খানিকটা মাথার চামড়া কাটিয়া গিয়াছিল শুধু। পরদিন সে দত্ত-খুড়ার বাড়িতে বসিয়া প্রশ্ন করিতেছিল, না খেলে শরীর হাঁজবে, কাকামশায়, আর রং ফরসা হয় কি সাবানে বলেন দেখি ?

বেণী ডোম—চৌকিদার আসিয়া তাহাকে ডাকিল, তোকে ডাকছে মতিলাল, পেসিডেনবাবু !

কেন ?—মতিলাল অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল।

বেণী বলিল, কাল তোকে লাঠি মারে নাই ফুলু মুখুজ্জে ? তাই লালিশ-টালিশ করতে বলবে তোকে হয়তো।

মতিলাল হাসিয়া বলিল, উ আমার লাগে নাই বেনোজেঠা। লালিশ আবার করে লোক—ওই নিয়ে !

তাই বলে আয় গিয়ে বাপু।

মতিলাল উঠিল। পথে ছেলের পাল সভয়-কৌতুকে দূরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল, ঝাঁটাবুড়ী, ও ঝাঁটাবুড়ী !

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিতেছিল।

পথে নারানবাবুর বাড়ির ভিতর কে বলিতেছিল, দুধ খাও খুকু, ডাকব ঝাঁটাবুড়ীকে!

মতিলাল বিনা দ্বিধায় বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া একমুখ দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, দুধ খাও খোকাবাবু!

ছেলেটা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। মা ছেলেকে লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া বলিল, বেরিয়ে যাও তুমি, বেরিয়ে যাও!

মতিলাল বাহির হইয়া আসিতেই বেণী জিজ্ঞাসা করিল, কী, হল কী তোর মতিলাল, অ্যাঁ? মতিলাল—মতে!

মতিলাল বাড়ি ফিরিল প্রহারজর্জরিত দেহে।

ভুবনের চোখে আজ জল দেখা দিল, সে তাড়াতাড়ি তেলের বাটি লইয়া বসিয়া বলিল, কী হল, কে মেলে?

মতিলাল ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিল, ছোট ছেলে আমাকে দেখে প্যাঙাশ-পারা হয়ে গেল ভোবন!

ভুবন প্রশ্ন করিল, কে মেলে কে তোকে?

পেসিডেনবাবুর চাপরাসী। গাঁ ঢুকতে বারণ হয়ে গেল, ছোট ছেলেতে ভয় পাবে আমাকে।—কণ্ঠস্বর তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল।

ভুবন চকিত হইয়া বলিল, ও কি, মাদুলি ধরে টানছিস কেনে, ওই?

পট করিয়া মাদুলির সুতা ছিড়িয়া লইয়া মতিলাল বলিল, আমাদের ছেলে আমাদেরই মতো কুচ্ছিত হবে তো ভোবন! কাজ নাই।

মুসাফিরখানা

বাঙালীর জীবনে 'মধুচন্দ্রিকা'র স্থান নাই, অন্তত সাধারণ বাঙালীর জীবনে। পল্লীগ্রামে মা, মাসী, পিসী, বোন লইয়া আমাদের সংসার। তাঁহাদের ফেলিয়া স্ত্রীকে লইয়া 'কপোত-কপোতী' সম দুর-দুরান্তরে নীড় বাঁধিবার রেওয়াজ এখনও হয় নাই। কেরানি জীবনে অনেকে অবশ্য স্ত্রীকে বাসায় লইয়া আসেন, কিন্তু সেখানে হাঁড়ি কড়া বেড়িতে বাঁধিয়া রাখে স্ত্রীকে, এবং আপিসের সাহেব বাঁধিয়া রাখে স্বামীকে। রাত্রিতে একই শয্যায় উভয়ের মধ্যে বহে ক্লান্তির বন্যা—ভরা ঘুমের নদী। অবস্থাটা হয় চখা-চখীর মতো। কিন্তু আমার জীবনে বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে সহসা এমনই মধুর অবকাশ একবার মিলিয়া গেল।

মা ও পিসীমা গিয়াছিলেন তীর্থভ্রমণে; তবুও পল্লীর মধ্যে মধু জীবনটা বেশ জমিতেছিল না। এমনই সময় গ্রামের আশেপাশে মহামারী দেখা দিল। সংবাদ পাইয়া স্ত্রী ভয়ে যেন বিবর্ণ হইয়া গেলেন। তাঁহার জীবনে ভয় এবং ক্রোধ দুইটি বস্তু সমপরিমাণে বর্তমান। কিসে কিসে তাঁহার ক্রোধ হয়, তাহার ফিরিস্তি আর দিব না, তবে ভয়ের কারণের ফিরিস্তিটা উপভোগ্য হইতে পারে, তাই না দিয়া পারিলাম না। তিনি ফড়িং দেখিয়া ভয় পান, জোঁক দেখিলে ঘরে খিল দেন, গোরুকে ভয় করেন, গাধাকে ভয় করেন, সন্ধ্যা হইলে ছায়া দেখিয়া চমকাইয়া উঠেন, চোরের নাম শুনিলে রাত্রে তাঁহার ঘুম হয় না, রাত্রে বাতাসে জানালা নড়িলে তিনি 'ভূমিকম্প' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। বাঁদরকে ভয় করেন, ইঁদুরকে ভয় করেন, ছুঁচোকে ভয় করেন, আরশোলাকে ভয় করেন, ভয় করেন না শুধু আমাকে।

মহামারীর নাম শুনিবামাত্র তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।

সাহস দিয়া বলিলাম, ভয় কি? আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে কলেরাকে কুকুর-বেড়ালের মতো তাড়ানো যায়, জান?

তিনি সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, তোমার মুখের কি আগল নেই? কুকুর-বেড়ালের মতো, ও কি কথা?

মধ্যরাত্রে আমাকে ঠেলা দিয়া জাগাইয়া বলিলেন, ওগো, আমার শরীরটা কেমন করছে!

আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম, আলোটা বাড়াইয়া দিয়া বলিলাম, কী রকম হচ্ছে?

এই দেখ, হাত-পাগুলো কেমন সব ঠাণ্ডা হিম হয়ে গিয়েছে। পেটের মধ্যেও কেমন যেন—

নিজেও একটু-আধটু নাড়ি দেখিতে জানি, পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, অসুখ তাঁহার একমাত্র ভয় ছাড়া আর কিছু নয়। সমস্ত রাত্রিটা তাঁহাকে সাহস দিবার জন্য জাগিয়া কাটাইতে হইল।

পরদিন প্রাতেই কিন্তু আমার একটু ভয় হইল। আমাদের গ্রাম ও মহামারী-আক্রান্ত মুসলমানের গ্রামখানি একেবারে পাশাপাশি। শুনিলাম, রাত্রেই রোগ আমাদের গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। অপরাহ্ণে শুনিলাম, আমাদেরই গ্রামে আরও দুই ব্যক্তি আক্রান্ত হইয়াছে।

আর গ্রামে থাকিতে সাহস হইল না। রোগের ভয় নয়, ভয় হইল, আমার স্ত্রীর হৃদ্‌যন্ত্র কখন অকস্মাৎ বিকল হইয়া যাইবে। স্থানীয় ডাক্তার আমার বন্ধু, তিনিও বলিলেন, আপনি ওঁকে নিয়ে সরেই যান, এ রোগে ভয়টা একেবারেই ভাল নয়

১—২৯

অগত্যা গ্রাম ছাড়িতে বাধ্য হইলাম। অনেক চিন্তা করিয়া কলিকাতাই ভালো মনে হইল। আসিয়া প্রথমে এক আত্মীয়ের বাসায় উঠিয়া একটা বাড়ি দেখিয়া লইলাম।

সকালে বাসায় উঠিয়া সন্ধ্যাতেই রিকশা করিয়া সিনেমা দেখিতে গেলাম। জীবনে আকস্মিকতার মধ্য দিয়া 'মধুচন্দ্রিকা' আসিয়া গেল। সমস্ত সংসারটা যেন একটি জ্যোৎস্নালোকিত সুসমতল পথের উপর দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া চলিতেছিল।

উপমা দিয়া এ সময়টুকুর স্বরূপ বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়, এ যেন একটি মধুর স্বপ্ন। স্বপ্নের মতোই অকস্মাৎ এ অবস্থার অবসান হইয়া গেল। একদা চিঠি পাইলাম, মা ও পিসীমা দেশে ফিরিয়াছেন, দেশও ভালো আছে, সুতরাং দেশে ফিরিতে হইবে।

স্ত্রী বলিলেন, কালই চল। বাবা, এই দেশে মানুষ থাকে!

অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, একটা ফর্দ করে ফেল দেখি!

কিসের?

কি কি কিনতে হবে, তারই। কড়াই, ডাল-ছাঁকনা দুখানা, ধূপশলাকা, আর একটা বেশ ভালো দেখে শিল নিয়ে যেতে হবে।

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, সে সব হবে এখন পরে। আজ সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও দেখি, বটানিক্যাল গার্ডেন যাব।

প্রশ্ন হইল, সে আবার কি? কোথায়?

বাগান, বাগান। সেখানে নানা রকমের গাছপালা আছে। পৃথিবীর—

গাছপালা! সে আবার কী দেখব? সে আর দেখতে হবে না বাপু, তার চেয়ে বরং জিনিসগুলো কিনে আন!

বাকবিতণ্ডার শেষে তাঁহার কথাই থাকিল, বাজারে শিল কিনিতেই ছুটিলাম। খুব ভারী ওজনেরটাই পছন্দ করিলাম, যেন গলায় ঝুলাইলে একেবারে তলাইয়া যাই, সংসার-সমুদ্রের জলরাশির উপর আর কখনও যেন ভাসিয়া না উঠি। শিলখানা দেখিয়া তিনি খুব খুশি হইয়া উঠিলেন, তারিফ করিয়া বলিলেন, বেশ জিনিস কিনেছ, দু-তিন পুরুষ কেটে যাবে। ওজনসই নইলে জিনিস!

ঘরের দেওয়ালে বিলম্বিত আয়নাখানার মধ্যে প্রতিফলিত আমারই ক্ষীণকায় মূর্তির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম। যাক!

অতঃপর কুঞ্জভঙ্গের পালা! সাধের সাজানো বাসাটি ভাঙিয়া মোটঘাট বাঁধিতে সমস্ত দিনটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যায় সাড়ে সাতটায় ট্রেন। তাড়াতাড়ি গাড়ি

ডাকিয়া আনিলাম ; মোটঘাট দেখিয়া সে বলিল, একটা গাড়িতে এত মাল যাবে না বাবু।

প্রথমে ঝগড়া করিলাম। গাড়োয়ানটা গাড়ির মুখ ফিরাইয়া চাবুক ঘুরাইয়া জিভ দিয়া শব্দ করিল, ক্যাঃ—ক্যাঃ—ক্যাঃ !

ঘোড়া দুইটা বার কয়েক নাক ঝাড়িয়া নড়িয়া উঠিল। অগত্যা তখন আরম্ভ করিলাম তোষামোদ। অবশেষে আরও কয়েক আনা ভাড়া অধিক স্বীকার করায় একটা আপোষ হইয়া গেল।

স্টেশনে আসিয়া দেখি, ট্রেনখানি যথাসময়ে চলিয়া গিয়াছে।

স্ত্রী বলিলেন, ঐ ঘোড়া দুটোর অভিসম্পাতে। আহা-হা, জীব, জীব তো বটে ! অমনই করেই কি মারে ! দেখ, সত্যিই ওদের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

আমার চোখে জল অবশ্য আসে নাই, কিন্তু চোখে আমি অন্ধকার দেখিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, উপায় !

উপায় একমাত্র লাস্ট ট্রেন। সাড়ে দশটায় হাওড়ায় চাপিয়া রাত্রি দুইটায় বর্ধমানে নামিতে হইবে। দুইটা হইতে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত বর্ধমান মুসাফিরখানায়, ভোর পাঁচটায় ট্রেন মিলিবে বর্ধমানে।

কিন্তু তদ্ভিন্নই বা উপায় কি ? অগত্যা ভীরু মনকে উৎসাহ দিয়া বলিলাম, চলো মুসাফের, বাঁধো গাঁঠরি !

যথাসময়ে আসিয়া বর্ধমান পৌছিলাম।

স্ত্রী ঘুমাইতেছিলেন, মহা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তোমার হাতে পড়ে আমার আর লাঞ্ছনার শেষ রইল না।

রাত্রির শেষ প্রহরে ক্লান্ত দেহে আর কলহ করিতে প্রবৃত্তি হইল না, রসিকতা তো দূরের কথা। জীবনের রস তখন রস-বিকারে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইচ্ছা হইল, ঠাস করিয়া তাঁহার গালে একটি চড় বসাইয়া দিই ; অথবা ওই শিলটা নিজের মাথায় মারিয়া মরি।

মুসাফিরখানায় মালপত্র রাখিয়া স্ত্রীকে জেনানা-অন্ধকূপে বসাইয়া দিলাম। একটা ইলেক্ট্রিক আলো সেখানে জ্বলিতেছিল, দেখিলাম, একটি প্রৌঢ়া সধবা ও একটি তরুণী বিধবা সেখানে রহিয়াছেন। প্রৌঢ়া ঘুমাইতেছেন, বিধবাটি জাগিয়া বসিয়া আছেন।

আমার স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র তরুণীটি বলিয়া উঠিলেন, আসুন ভাই, বাঁচলুম। একা জেগে বসে প্রাণ আনচান করছে।

স্ত্রী বলিলেন, আপনারা বুঝি অনেকক্ষণ এসেছেন ?

আমি তাঁহার সম্বন্ধে অন্তত নিশ্চিন্ত হইলাম। একটু চায়ের চেষ্টায় চা-ওয়ালার সন্ধানে চারিদিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য! হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—দেশে মধ্যে মধ্যে ভেড়াওয়ালারা আসে, তাহাদের আদর করিয়া লোকে আপন আপন খেত-জমিতে বসায়। গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি করিয়া ভেড়ার পাল চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুমায়; এখানে ওখানে দুই-চারিটা গুঁতোগুঁতিও করে। এও তাই।

ঐ এক কোণে পানওয়ালার দোকানে কনস্টেবলটা লাঠি হাতে ঢুলিতেছে, ওই লোকটাই ভেড়াওয়ালা। আর এক ধার হইতে অন্য ধার পর্যন্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন যাত্রীর দল গায়ে গায়ে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছে।

বোম শঙ্কর শূলী শম্ভু দুনিয়া তো ঝুটা টুটা, আও ফুটা, মেকী আও, আও ফাঁকি; ভজ কিষণ রাধা—দিল করো সাদা! হর-হর-বোম্!

শব্দ লক্ষ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলাম, এই ভিড়ের মধ্যে এক সাধুও জুটিয়া গেছেন; 'চেলা-চামুণ্ডী'রও অভাব নাই। সেখানে গাঁজা চলিতেছে।

পাশের একজন যাত্রী আপত্তি করিয়া উঠিল, আঃ, কি বিপদ, গাঁজা খাবে তো সরে গিয়ে খাও হে বাপু। এখানে নেশা করবার হুকুম নেই।

বাবাজী ঊর্ধ্বনেত্র হইয়া দম বন্ধ করিয়া গাঁজার ধোঁয়াটা হজম করিতেছেন। জন দুই চেলা একেবারে আগুন হইয়া উঠিল, হুকুম কার রে বাপু? হুকুমের কার ধার ধারি? আমরাও টিকেট করেছি। তোমার গন্ধ লাগে তো তুমি সরে যেতে পার।

প্রতিবাদকারী বলিল, বেশি লোকের সুবিধে অসুবিধে—

Shut up, I say, you shut up, চুপ রও বলছি!—গঞ্জিকাচক্রের একপাশ হইতে একটি ছোকরা এবার চীৎকার করিয়া উঠিল। কনস্টেবলটার তন্দ্রা ভাঙিয়া গিয়াছিল, সে ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিয়া সব বুঝিয়া লইয়া চক্রের নিকট আসিয়া বলিল, পরসাদ তো মিলে সাধু মহারাজজী!

কথার শেষে সে আড়ামোড়া দিয়া হাই তুলিয়া আলস্যটাকে বেশ করিয়া কাটাইয়া লইল।

প্রতিবাদকারী এবার নীরবেই নাকে কাপড় দিয়া মুখ ফিরাইয়া জড়সড় হইয়া শুইল।

অকস্মাৎ নারীকণ্ঠের খিলখিল হাসিতে মুসাফিরখানার টিনের চালাটা গমগম করিয়া উঠিল। একটা সাঁওতালের মেয়ে হাসিতেছে, তাহার পাশে বসিয়া একটি সাঁওতাল যুবা, সেও মৃদু-মৃদু হাসিতেছে।

কে একজন জিজ্ঞাসা করিল, উ তোর কে বটে মাঝি?

মাঝি বোধ হয় চটিয়া উঠিল, সে উত্তর দিল, কেনে ?

না, তাই জিগ্যেস করছি।

কেনে, তা করবি কেনে ?

যা গেল, তা বললে কিছু দোষ আছে নাকি ?

মাঝি গম্ভীর হইয়া রহিল। মেয়েটা বলিল, একটি বিড়ি দে কেনে বাবু! উ আমার—কি বলিস তুরা ?—বর হয়।—বলিয়া সে আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উপরে আলোটার চারিধারে একটা ফড়িং ক্রমাগত ফরফর করিয়া উড়িতেছে। ছোট ছোট পতঙ্গ সংখ্যাতীত।

ও মশায়, পা দুটো গুটিয়ে নিন না! পা মেলে শুতে হলে, ফাস্ট সেকেন কেলাসে যেতে হয়! শুয়েছে দেখ না, যেন ঘটোৎকচ!

যে শুইয়াছিল সে ভদ্রলোক, বিনা প্রতিবাদেই পা গুটাইয়া লইল। শুধু গুটাইয়াই লইল না, গায়ে পা দিবার অপরাধ-বোধে সে একটি নমস্কারও করিল।

এ ভদ্রলোক কিন্তু রূঢ় ব্যবহারের উত্তরে এমন বিনীত ব্যবহার পাইয়া আরও চটিয়া গেল, সে আপন মনেই বকিতে আরম্ভ করিল, সব যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ! দেখ না, দিলে জামাটায় পায়ের ধুলে লাগিয়ে, হুঁঃ! দেখ না সব কাণ্ডকারখানা!

ঢং—ঢং—ঢং—ঢং—ঢন-ন-ন-ন।

কোনো একটা ট্রেন আসিতেছে। কুলির দল ডাউন প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটিয়াছে। এইবার আমিও সচকিত হইয়া উঠিলাম। এই বিচিত্র রঙ্গমঞ্চের ততোধিক বিচিত্র অভিনয় দেখিয়া সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। চায়ের জন্য প্ল্যাটফর্মের মধ্যে যাইতে হইবে।

জেনানা-অন্ধকূপের দুয়ারে গলার সাড়া দিয়া প্রশ্ন করিলাম, চা খাবে নাকি ?

স্ত্রী উঠিয়া আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, দু কাপ এনো।

ভিতর হইতে কথা ভাসিয়া আসিল, আমি তো খাব না।

মুখ ফিরাইয়া স্ত্রী বলিলেন, কেন ? পরক্ষণেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ও!

তারপর বলিলেন, বামুনের তৈরি চা তুমি একটু খুঁজে নিয়ে এসো, দু কাপই এনো।

আবার মৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন, আহা-হা, এই কচি বয়েস, এরই মধ্যে সব শেষ করে বাপের বাড়ি চলল।

আমিও একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিলাম না। সাধু বাবাজী তখন

কনস্টেবলপ্রমুখ শিষ্যবর্গকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতেছিলেন, এই নাভিকুণ্ডমে একঠো শতদল পদ্ম হ্যায়, বক্ষদেশমে—

বুঝিলাম, কনস্টেবলটিই বাবাজীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য হইয়া উঠিয়াছে।

হিন্দী ভাষণ চলিতেছে।

যাঁহার গায়ে পা ঠেকিয়াছিল, সেই ভদ্রলোকটি আমাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, ও মশাই, আপনি কি প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছেন? দেবেন তো একটা চা-ওয়ালাকে বলে, এখানে যেন চা দিয়ে যায়। ও মশাই, আপনার কাছে দেশলাই আছে? একবার দিন তো! দেশলাইটা দিন তো, শুনছেন!—এবার তিনি খোঁচা দিয়া ডাকিতেছিলেন, যে তাঁহার গায়ে পা দিয়াছিল, সেই ভদ্রলোককে।

দেশলাইসুদ্ধ একখানা হাত শুধু বাহির হইয়া আসিল। এ ভদ্রলোক একটা একটা বিড়ি ধরাইয়া দেশলাইটা নিজের পকেটেই পুরিলেন।

প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়া বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না।

ইণ্টার ক্লাসের ওয়েটিং-রুমের সম্মুখে দেখি—পরিচিত সাহিত্যিক বন্ধুর দল। আমাকে দেখিয়া কয়েকজন চীৎকার করিয়া উঠিল, এসেছে--এসেছে—এসেছে!

একজন আমার ঘর্মসিক্ত ময়লা জামা ও রুক্ষ চেহারার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, দেখুন মশাই, আপনারা বিচার করুন, এই কি কখনও কোন ভদ্রলোকের চেহারা হয়?

হয়ই না তো! কিন্তু তোমরা এখানে কোথায়? ব্যাপার কী?

একজন বলিল, সাহিত্যে যত ইচ্ছে ন্যাকামি কর, কর। কিন্তু সাহিত্যিকের কাছে মুখে ন্যাকামি চলবে না।

এই সময় একজন ওয়েটিং-রুম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, এই যে, এসেছে! যাক, বেটার লেট ছান্ নেভার; কিন্তু রাস্কেল, তোমার ব্যাপার কী? এ কি চেহারা তোমার? তুমি কি স্ত্রীর কাছ থেকে রাত্রে অ্যাবস্কণ্ড করেছ নাকি?

সর তো, সর তো, দেখি আমি একবার ওকে!

সম্মুখস্থ বন্ধুটি সরিয়া দাঁড়াইতেই দেখি, নিখিল বরবেশে দাঁড়াইয়া। এ কি, নিখিলের বিবাহ!

আনন্দের উৎসাহটা এত প্রবল হইয়া গেল যে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেই কোমর ঘুরাইয়া নাচিয়া গাহিয়া উঠিলাম, 'এতদিনে ফুটল সখি, সাধের বিয়ের ফুল'!

নিখিল আমার মাথায় একটা চাঁটি মারিয়া বলিল, কিন্তু তোর এত দেরি কেন গাধা?

বলিলাম, আমি তো কোনো খবরই পাই নি!

সে বলিল, বাঃ, আমি নিজে হাতে চিঠি দিয়েছি।

কোথায় ?

কেন, তোমার দেশে !

হরি হরি ! আমি যে আজ এক মাসের ওপর দেশছাড়া।

কোথায় কোন চুলোয় গিয়েছিলি ?

এবার থতমত খাইয়া গেলাম। কলিকাতায় ছিলাম বলিলে আর রক্ষা থাকিবে না আমার। ধাঁ করিয়া মিথ্যা বলিয়া বসিলাম, বলিলাম, সে আর বলিস কেন ভাই ! মেমারিতে নেমে আমার দিদির ওখানে যেতে হয়, সেখানে গিয়েছিলাম, অবশ্য একা নয়, স্ত্রীকে সুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে। দিদির অসুখ হয়েছিল। এই আজ বাড়ি চলেছি।

নিখিল প্রশ্ন করিল, তোর স্ত্রী ? তিনিও তোর সঙ্গে রয়েছেন নাকি ?

আবার মিথ্যা বলিলাম, শুধু সঙ্গে, একেবারে শয্যাশায়িনী হয়ে সঙ্গে। তিনি নিয়ে এলেন বর্ধমানের ম্যালেরিয়া।

নিখিল চিন্তিত হইয়া বলিল, তা হলে তুই যাবি কেমন করে ?

বলিলাম, আমার আর যাওয়া হয় না ভাই।

ওদিকে একদল ব্রিজ খেলিতেছিল, তাহাদের এতক্ষণ কথা বলিবার অবসর ছিল না। এইবার তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল, গেম—গেম—রবার হয়ে গেছে। বয় বয়, এই, বোলাও বয়কে !

আমি নিখিলের বিবাহের কথাই ভাবিতেছিলাম।

নিখিল এতদিনে বিবাহ তবে করিল ! নিখিল শুধু সাহিত্যিক নয়, তাহার জীবনের বৈচিত্র্য সত্যই বিচিত্র। সে প্রতিভাবান ছেলে।

অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে সে, বাপ তাহার ছিলেন খাঁটি জমিদার। আট বৎসর বয়সের সময় তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পৌত্রীর সহিত। মেয়েটির বাপও তখন সরকারী চাকুরিতে ঢুকিয়াছেন। তিনি তখন ডি. এস. পি.। তখন হইতেই উভয় ঘরের মধ্যে তত্ত্ব-তল্লাস চলিত।

বাল্যবন্ধুরা নাকি নিখিলকে খেপাইত, 'গাড়ুর ওপর গামছাখানি, নিখিলেশের কুন্দরানী'।

ভাবী বধূর নাম ছিল নাকি কুন্দরানী। বয়স তখন তাহার আট মাস। কন্যাটির অন্নপ্রাশনের সময় নিখিলেশের বাপ সেখানে গিয়াছিলেন, সেই সময় কথা পাকা হইয়া যায়। তারপর নিখিলের বয়স যখন বারো তখন তাহার বাপ হঠাৎ মারা গেলেন। তাহার পিতৃবন্ধু, তাহার ভাবী বধূর পিতামহ ম্যাজিস্ট্রেটপদে উন্নীত হইয়াছেন। তিনি

লিখিলেন, নিখিলকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তাহার পড়াশুনার ভার তিনি লইবেন।

কিন্তু নিখিলেশের মা ছিলেন, যাহাকে বলে, মর্যাদাময়ী তেজস্বিনী মেয়ে। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—

নিখিলের জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। সে অমানুষ হইবে না। সন্তানকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে মা, আর আমি এখনও বাঁচিয়া আছি।

উত্তরে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াই পত্র দিয়াছিলেন ; কিন্তু নিখিলের মা তাহা গ্রাহ্যই করেন নাই। সে অসন্তোষ আর বাড়িতে পায় নাই, উভয় পক্ষেরই ভদ্রব্যবহারের গুণে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। যেমন তত্ত্ব-তল্লাস চলিতেছিল, চলিতেই থাকিল।

নিখিল যেদিন ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া স্কলারশিপ পাইল, সেদিন কিন্তু নিখিলের ভাবী দাদাশ্বশুর ক্ষমা চাহিয়া নিখিলের মাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তারপর নিখিল আই. এ., বি. এ. পাস করিল। এবার কন্যাপক্ষ উতলা হইয়া বিবাহের জন্য নিখিলের মাকে ধরিয়া বসিলেন। নিখিলের মায়ের আর আপত্তি ছিল না, কিন্তু নিখিল আপত্তি করিল, পড়া শেষ না করিয়া সে বিবাহ করিবে না।

নিখিলের মা বলিয়াছিলেন, বেশ তো, আর দিন কতক অপেক্ষাই করুন না! কুন্দর বয়স তো হল এই তেরো। আর একটা কি দুটো বছর!

ভদ্রলোক নিজে শিক্ষিত ব্যক্তি, তিনি আর আপত্তি করিলেন না। নিখিলের জন্য একটা বড় চাকুরির ব্যবস্থায় তিনি চেষ্টিত হইয়া রহিলেন।

ইহার পর অকস্মাৎ একদিন দেশে নিখিলেশের মায়ের কাছে সংবাদ আসিল, নিখিলেশ পড়া ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকালেই নিখিলের ভাবী দাদাশ্বশুর নিজে আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, বলিলেন, এই ডেঁপোমির ভয়ে আমি তখন আপনাকে লিখেছিলাম, নিখিলকে আমার হাতে দিন।

নিখিলের মা বলেছিলেন, আমি কিন্তু একে ডেঁপোমি বলে মনে করি না।

মনে করেন না? জেল হয়ে যাবে যে!

জানি। কিন্তু তবুও তো একে খারাপ কাজ আমি বলতে পারব না।—নিখিলের মা এই উত্তর দিয়াছিলেন।

এই কথার পর আর কথা চলে না, এবং উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুতে থাকিয়া পরস্পরের হাত ধরাও চলে না; সুতরাং কুন্দরানী ও নিখিলের বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল। শুনিয়াছি, মেয়েটি নাকি সেদিন কাঁদিয়াছিল। নিখিলের কাঁদিবার অবসর ছিল না, সে তখন কারা-দ্বারের লৌহকপাটে করাঘাত করিতে ব্যস্ত।

জেল হইতে ফিরিয়া নিখিল হইল সাহিত্যিক। সে সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করিল, ক্ষুরধার তরবারি হাতে লইয়া। দেখিতে দেখিতে অগ্রগামিগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া সে পুরোভাগে আপন স্থান করিয়া লইয়াছে। আজ বাংলা দেশে নিখিলেশকে না জানে কে?

তবুও নিখিলেশ আজও বিবাহ করে নাই। কত কুমারীর প্রণয় সে উপেক্ষা করিয়াছে। তাই ভাবিতেছি, কে সে ভাগ্যবতী, যে নিখিলকে বন্দী করিল!

সেই প্রশ্নই চুপিচুপি করিলাম, বলিলাম, ভাগ্যবতীটি কে?

নিখিল হাসিয়া বলিল, নিতান্তই অপরিচিতা, চোখে দেখিও নি।

মানে?

মানে, আমাদের অধিকাংশেরই যেমন ধারায় বিয়ে হয়ে আসছে, এও তাই। মা বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছেন, আমি চললাম টোপর মাথায় দিয়ে।

সে কি রে?—বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না।

উত্তরে সে শুধু হাসিল।

আমি আবার বলিলাম, তুই সত্যি বলছিস নিখিল?

বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞেস কর সকলকে। মা ধরে বসলেন, এইবার তোমাকে বিয়ে করতেই হবে, আমি নিজে মেয়ে দেখে সম্বন্ধ করে রেখেছি। আমি বললাম, বেশ। দিন স্থির হয়ে গেল, কাল বিয়ে।

জায়গাটা কোথায়?

বর্ধমান-কাটোয়া লাইনে। সকালে ট্রেন। তাই রাত্রে এসে বসে আছি।

দেখ দেখ, দুটি মেয়ে আমাদের দেখছে।

পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, তাহারা অপর কেহ নন, আমার স্ত্রী আর সেই তরুণীটি। তাঁহারাও কেমন করিয়া বিবাহের বরের সন্ধান পাইয়া ঘরের জানালা হইতে উঁকি মারিয়া বর দেখিতেছেন।

নিখিল বলিল, বাঙালীর মেয়ে চিরদিনই মনে মনে বিয়ের কনে থেকে যায় বোধ হয়। বর দেখলেই তাদের বিয়ের বাসর মনে পড়ে।

হাসিয়া বলিলাম, সত্যি কথা। কিন্তু বোস, আমি আসছি। তাঁর জন্যে চায়ের সন্ধানে বেরিয়েছি।

নিখিল হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল, আরে আরে, এইখান থেকে চা দিয়ে আসছে। সঙ্গে স্টোভ রয়েছে, ঠাকুর রয়েছে, চাকর রয়েছে।

আমারও একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, বলিলাম, ভালো কথা, তোদের ঠাকুর আছে, তাকেই একটু চা করতে বল তো! সঙ্গে বিধবা আছেন।

ও প্ল্যাটফর্মে তখন দুইটা কুলিতে মাল লইয়া চরম কলহ বাধাইয়া তুলিয়াছে।

একজন ভদ্রলোক একটি রেলের বাবুর পিছনে পিছনে কাকুতি-মিনতি করিতে করিতে যাইতেছিল, এই দেখুন আট আনা আমি দিচ্ছি। এই নিন।

রেলের বাবুটি তখন পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অপেক্ষাও বড়লোক, তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, ও, নো নো।

শুনছেন, শুনুন শুনুন—তাই নিন দয়া করে! সামান্য মালের জন্যে আর—

চা লইয়া জেনানা-অন্ধকূপের দিকে যাইতে যাইতে যাইতে শুনিলাম, সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং-রুমের মধ্যে এক ভদ্রলোক তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, ইমপসিবল হতে পারে না, হাজার বছরেও না। স্বরাজ, ইন্‌ডিপেণ্ডন্স! অসম্ভব! কই বুঝিয়ে দিন আমাকে কি করে হবে!

কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না, কাটা দরজার নীচে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, এক স্থূলকায় স্থবির চীৎকার করিতেছেন, এবং তাঁহার সম্মুখে একজন প্রায়-প্রৌঢ় মুখ লাল করিয়া বসিয়া আছেন।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক কি বলিতে গেলেন, কিন্তু স্থবির অকস্মাৎ যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া দুই হাতে পা ধরিয়া সন্তর্পণে পাখানি নামাইতে নামাইতে বলিলেন, চীৎকার করেছি আর চিড়িক মেরে উঠেছে! উ, বাত যেন কোন মানুষের না হয়! ধর্মরাজ কালী—কত করলাম, উ-হু-হু! বোগাস, সব বোগাস, উ-হু-হু!

দৃশ্যটি আরও কিছুক্ষণ দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু চা-বাহী ঠাকুরটি স্মরণ করাইয়া দিল, চা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে। অগত্যা চলিলাম, রাস্তার পাশেই পার্সেল-আপিস, সেখানে দেখিলাম—একটা ফলের ঝুড়ির সামান্য খানিকটা কাটিয়া এক ভদ্রলোক তাহার মধ্যে হাত পুরিয়াছেন।

জেনানা-অন্ধকূপের সম্মুখে দেখি এক টেরি-কাটা ছোকরা কখন আসিয়া জুটিয়া গিয়াছে, সে একখানা বই বাজাইয়া গান করিতেছে—

'তোমারেই ভালো-বে-সে, সয়েছি কত যাতনা—কত অপমান,

তোমারেই ভালো-বে-সে—'

তাহাকে উৎসাহ দিয়া তানের মাথায় একটা বাহবা দিয়া দিলাম। জেনানা ওয়েটিং-রুমের দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিলাম, চা নাও!

স্ত্রী চা লইয়া গেলেন, শুধু প্রশ্ন করিলেন, বামুনের তৈরি তো?

বলিলাম, একেবারে বামুনঠাকুর, দেখ না, লোকটার গলার পৈতে কত ময়লা!

দরজা হইতে ফিরিয়াই দেখি, গায়ক ছোকরা সরিয়া পড়িয়াছে। আরও

একটু খুঁজিতেই দেখিলাম, ছোকরা সাধুবাবাজীর ধর্মচক্রে গিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। সেখানে পুনরায় গাঁজা তৈয়ারি হইতেছে।

ওপাশের পানের দোকানটার তক্তাপোশের উপর বসিয়া এক পাগলী বিড়বিড় করিয়া বকিতেছে। পাগলী নিত্য রাত্রে আসে, বহুবার আমি উহাকে দেখিয়াছি।

কনস্টেবলটা তাহাকে ধমক দিল, এই পাগলী, বকবক মৎ করো।

পাগলী ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, কি যে বলিস, মাইরি? না না, ছি ছি ছি! বাবু, টিকিস-বাবু!

টিকিট-ঘরের জানালায় ঠকঠক করিয়া শব্দ করিতে করিতে একদল যাত্রী ডাকিতেছিল, টিকিস-বাবু!

নিখিলের ওখানে যাইবার আগেও আমি ইহাদের দেখিয়া গিয়াছি, ওই টিকিট-ঘরের সম্মুখে এমন করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে।

ঢং—ঢং—ঢং—ঢন-ন-ন।

আবার কোন গাড়ি আসিতেছে।

একদল যাত্রী মোটঘাট লইয়া উঠিয়া পড়িল।

মসো, ও মসো, ওঠ গো, গাড়ি আইচে! অই অই—ও মসো!

ওই ওই—আমার পোঁটলা কে নিলে গো! আমার পোঁটলা!—এক বৃদ্ধার পোঁটলা চুরি গিয়াছে, সে ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিতেছে।

ওদিকে সশব্দে ট্রেনখানা আসিয়া পড়িল।

চা গ্রোম, হিন্দু চা!

সিগ্রেট পান, সিগ্রেট পান!

এত রাত্রে আর 'লুচি কচৌরি' নাই। যাত্রীরা সব কলরব করিতেছে।

কুলি কুলি! এই চা!

ও মশাই, ও মশাই!

অকস্মাৎ কলরবটা প্রবল হইয়া উঠিল, কিছু অস্বাভাবিক রকমের প্রবল।

উঠিয়া গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, একটা কামরার মুখে যাত্রী, রেলকর্মচারী ও পুলিসের ভিড় জমিয়া গিয়াছে।

স্ট্রেচার, স্ট্রেচার! ডাক্তারকে খবর দাও।

না না, একেবারে হাসপাতালে ভেজে দাও বাবা! ও হাঙ্গামা এখানে কেন বাবা?

ব্যাপারটা বুঝিলাম না, তবুও অনুমান করিলাম, যাহার সর্বত্র অবারিত গতি, সেই কোনো অঘটন ঘটাইয়াছে।—মৃত্যু!

হটো হটো হটো!

ভিড় সরিয়া গেল, দেখিলাম—স্ট্রেচারের উপরে শুইয়া একটি কুলি-জাতীয়া স্ত্রীলোক, আর তাহার কোলের কাছে রক্ত-ক্লেদাক্ত একটি শিশু।—মৃত্যু নয়।

ঢং—ঢং—ঢং।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

বাবু!—ফিরিয়া দেখি আমারই কুলিটা ডাকিতেছে।

গাড়ির সময় হইয়া গিয়াছে।

বাঁচা গেল, সাধুবাবাজীর গঞ্জিকার ধূমে আমারও নেশা ধরিয়া আসিতেছে। স্ত্রীর সঙ্গিনী সন্থবিধবা তরুণীটি প্ল্যাটফর্মের ফটক পর্যন্ত আগাইয়া আসিলেন।

এবার তাঁহাকে পরিষ্কার দেখিলাম, শ্যামবর্ণা তন্বী তরুণী একটি। সকরুণ মুখশ্রী, চোখের কোণে টানা অশ্রুর দুইটি ক্ষীণ রেখা আলোকচ্ছটায় তখনও চিকচিক করিতেছে। আমার স্ত্রীর চোখেও দেখিলাম জলের রেখা।

বুঝিলাম, সমস্ত রাত্রিই বেদনার কথা হইয়াছে।

নিখিলের কাছে বিদায় লইয়া আসিলাম। তাহারাও বি কে. আর.-এর ট্রেনের দিকে চলিয়াছে; তাহাদের ট্রেনের সময় হইয়াছে।

গাড়িতে বসিয়া দেখিলাম, স্ত্রী তখনও ফটকের দিকে চাহিয়া আছেন। সেখানে দেখিলাম, তরুণী বিধবাটি তখনও দাঁড়াইয়া।

অকস্মাৎ আমার মনে হইল, এই মেয়েটিই যদি কুন্দরানী হয়, নিখিলের যাহার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল!

ওদিকে নিখিলের বন্ধুর দল হুলুধ্বনি দিতেছে।

মেয়েটি ওই বরযাত্রীর দিকে চাহিয়া আছে, বর দেখিতেছে।

স্ত্রীকে প্রশ্ন করিলাম, মেয়েটির নাম কি?

চোখ মুছিয়া স্ত্রী বলিলেন, অমলা।

মিথ্যা অনুমান, কিন্তু তবু মনে হইল, ওই কুন্দরানী।

নিখিল বিবাহ করিতে চলিয়াছে, কুন্দ বিধবা হইয়া ফিরিতেছে। কেহ কাহাকেও চেনে না। এমন অজানিত বিয়োগান্ত কত দৃশ্যই তো অহরহ অভিনীত হইয়া চলিয়াছে এই সংসার রঙ্গমঞ্চে।

ঢং—ঢং—ঢং—ঢন-ন-ন-ন।

আমাদের গাড়িটা ছাড়িল। প্ল্যাটফর্মের বাহিরে তারের বেড়ার ধারে দাঁড়াইয়া পাগলী গাড়ির লোককে মুখ ভেঙচাইতেছে। মুসাফিরখানায় কলরব করিতেছে নূতন যাত্রীর দল। স্ত্রী তখনও চোখ মুছিতেছিলেন।

শ্মশান-বৈরাগ্য

মহলার মহিম বাঁড়ুজ্জে এ অঞ্চলে নাম-করা মহাজন।

টাকা নিজের ঘরে বাড়ে না, টাকা বাড়ে পরের ঘাড়ে।—এ নীতিকথাটি বাঁড়ুজ্জে বেশ জানিত এবং মনেপ্রাণে মানিতও। ফলে দাদন বাড়িতে বাড়িতে ছড়াইয়া পড়িল দেশময়; এবং কয়েক বৎসরেই চারিপাশে দশ ক্রোশের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ভূসম্পত্তি বাঁড়ুজ্জের কাছে ছিপে গাঁথা মাছের মতো আটকাইয়া গেল। কিন্তু এত বড় মাছ টানিয়া তোলা সহজ ব্যাপার নয়। দেশ জুড়িয়া দাদন আদায় সুকঠিন হইয়া উঠিল। খাতককে তাগাদা দিলে বলে, কাল যাইব। কিন্তু নিত্য কালের বিনাশ নাই, খাতক আসে না। স্বয়ং দেখা করিতে গেলে, লোকের কুটুম্বিতা ও কাজের হিড়িক পড়িয়া যায়। আত্মীয়বৎসল, কর্মতৎপর খাতকগুলির নাগাল পাইতে বাঁড়ুজ্জের ব্যাধি ধরিবার উপক্রম হইল।

এদিকে কে কোথা হইতে এক বেনামী দরখাস্ত ঝাড়িয়া দিল—ইনকামট্যাক্স আপিসে। বাঁড়ুজ্জের খত-খাতা, সিন্দুক, মায় হাঁড়ির খবর পর্যন্ত তাহাতে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো, খাতাপত্রসহ হাজির হইবার এক সমন বাঁড়ুজ্জের নামে আসিয়া গেল। রাজার সমনে আর সাক্ষাৎ শমনে তফাত বড় বেশি নয়—এ জ্ঞান বাঁড়ুজ্জের ছিল; নির্দিষ্ট দিনে হাজির সে হইল। কিন্তু সেখানে তাহার শাস্তির আর সীমা রহিল না। কোনোক্রমেই হাকিমকে সে বুঝাইতে পারিল না যে, খাতার অঙ্কগুলা টাকা নয়, কালির আখর মাত্র। শেষ পর্যন্ত নাচার হইয়া সে বলিল, ওসব, হুজুর, আদায় করে নেন গিয়ে। আমি কাগজ-কলমের সুদের উপর ট্যাক্স দিতে পারব না। ভ্রূকুটি করিয়া হাকিম কহিলেন, এখানে চালাকি জোচ্চুরি আরম্ভ করেছ নাকি? তোমাকে আমি প্রসিকিউট করব, জান! 'প্রসিকিউট' কথাটার অর্থ বাঁড়ুজ্জের অজ্ঞাত ছিল না। সে বিবর্ণ মুখে ফ্যালফ্যাল করিয়া হাকিমের দিকে চাহিয়া রহিল। বিনা আপত্তিতে ট্যাক্স ধার্য হইয়া গেল, বাৎসরিক বারোশো টাকা।

বাঁড়ুজ্জে কোনো কথা কহিল না, মনে মনে দাঁত ঘষিতেছিল খাতকগুলার উপর।

হাকিম খুশি হইয়া উঠিতেছিলেন। নথিপত্রে সই করিয়া ফাইলটা বন্ধ করিতে করিতে কহিলেন, আপনি বন্দুক নিয়েছেন? বন্দুক—নেন নি? আচ্ছা, দরখাস্ত করবেন গিয়েই, বন্দুক হয়ে যাবে আপনার।

'না' বলিতে বাঁড়ুজ্জের সাহস হইল না।

মনে মনে মারাত্মক একটা দিব্য গালিয়া বসিল, শালা, আর যদি মহাজনি করি তবে—

বেচারার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল।

কয়দিন পরেই বাঁড়ুজ্জে প্রকাণ্ড একটা কাগজের দপ্তরসহ আসিয়া হাজির হইল হরিহরপুরে। হরিহরপুরেই এ অঞ্চলের সব-রেজেস্ট্রী আপিস। বাঁড়ুজ্জের প্রতিজ্ঞা এবার যে-কোনও উপায়ে হউক তাহার দাদন সে গুটাইবে। হয় টাকা নয় জমি,—এই হইল তাহার মূল মন্ত্র। এই মন্ত্র লইয়া সে হরিহরপুরে পাকা রকমের আড্ডা গাড়িতে সঙ্কল্প করিল।

হরিহরপুরে বাঁড়ুজ্জের দূরসম্পর্কীয়া এক দিদির বাড়ি। বাড়িতে মাত্র দিদি ও তাহার বিধবা কন্যা বিভা ছাড়া কেহ নাই। বাড়ির বাহির হইতেই সে ডাকিতে শুরু করিয়াছিল, দিদি, দিদি, দিদি কই গো?

সঙ্গের লোকটি কাগজের প্রকাণ্ড বোঝাটা বহিয়া গলদঘর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। সে ধপ করিয়া বোঝাটা দাওয়ার উপর ফেলিয়া দিল।

বাঁড়ুজ্জে অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিল, কহিল, বেতমিজ, বেয়াড়া হারামজাদ, কাগজের দাম বোঝ না, বেটা চাষা! দলিলপত্র সব ফেটে যাবে যে! লোকটা পুরাতন ভৃত্য। কোনো উত্তর না দিয়া ঘাড়ে হাত বুলাইয়া সে তখন ঘাড়ের ব্যথা সারাইতেছিল।

বাঁড়ুজ্জে এদিকে-ওদিক দেখিয়া বিরক্তভরেই কহিল, এরা সব গেল কোথা রে বাপু? মরেছে নাকি সব? দিদি, বলি—ও দিদি! নে রে বেটা নে, তামাক সাজ দেখি একবার! হুঁকোটা বের করে জল ভর!

সম্মুখের মাটির দোতলায় সিঁড়ির দরজা খুলিয়া একটি শ্রীমতী বিধবা মেয়ে বাহির হইয়া আসিল। বাঁড়ুজ্জের পায়ের ধূলা লইয়া সে কহিল, মামা, কখন এলে?

এই মেয়েটিই বিভা, বাঁড়ুজ্জের দিদির মেয়ে।

বাঁড়ুজ্জে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ মামাই বটে। তা রাজকন্যে ছিলেন কোথা এতক্ষণে? ডেকে ডেকে যে গলা ফেটে গেল আমার? দিদি কই?

ম্লানকণ্ঠে বিভা বলিল, মায়ের বড় অসুখ মামা।

চোখ দুইটি তাহার ছলছল করিয়া উঠিল।

বাঁড়ুজ্জে চমকাইয়া উঠিল; মনের কথা চাপিয়া রাখিতে পর্যন্ত সে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, এই নাও! আচ্ছা বিপদ বটে তো! আমি এলাম কোথা, তা না, যাঃ কচু খেলে, অসুখের হাঙ্গামায় এসে পড়লাম।

বিভাই একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে সে বলিল, তা হোক না মামা, আমি তো রয়েছি, কোনো কষ্ট হবে না তোমার।

বাঁড়ুজ্জে ধমক দিয়া উঠিল চাকরটাকে, হ্যাঁ রে বেটা শূয়ার, হারামজাদা, ওরে উনোনে যে এখনও ধোঁয়া উঠছে। আর তুমি বেটা উল্লুক, বসেছ টিকে পোড়াতে। বেরো বেটা বেরো, এখুনই বেরো তুই বাড়ি থেকে। ঋণের দায়ে সব ঘুচিয়ে এখনও নবাবি গেল না তোমার।

চাকরটা বাঁড়ুজ্জেকে গ্রাহ্যও করিল না, সে টিকে পোড়াইয়া আগুন করিয়া হুঁকা-কলিকাটা আগাইয়া ধরিল। এতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিল, ও আগুনে জুত হবে না।

হুঁকা টানিতে টানিতে বাঁড়ুজ্জে উঠিয়া কহিল, ওরে, বাইরের ঘরটায় কাগজগুলো রাখ। ঘরটা পরিষ্কার করে আমাদের তালাটা লাগিয়ে দে।

বিভা বলিল, পরিষ্কার করাই আছে মামা। তোমাদের চৌকিদার এসে খবর দিয়ে গিয়েছিল যে! সব ঠিক করে রেখেছি আমি।

মামা বলিলেন, তা অসুখের খবরটা দিলেই পারতে বাপু। আমার এখন কাজ কত! টাকা-কড়ি আদায় করতে আমার দু-তিন মাস লেগে যাবে। তা না, কোথা অসুখ-বিসুখ! হুঃ, সময়ও পায় না সব অসুখ করতে! চল রে বাপু চল, দেখে আসি, কি হয়েছে! হ্যাঁ, আগে ওই বেটা চাষাকে দে তো এক থালা মুড়ি, গিলুক বেটা চাষা। তুই দে, আমি বরঞ্চ দেখে আসি।

হুঁকা হাতে বাঁড়ুজ্জে উপরে উঠিয়া গেল। সিঁড়ির প্রান্ত হইতেই সে ডাকিতে শুরু করিল, দিদি, দিদি, ও দিদি! আচ্ছা কাণ্ড তোমার বাপু!

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া একখানা থালা বাহির করিল। সেখানা আঁচল দিয়া মুছিতে মুছিতে কহিল, হাত-পা ধুয়েছ, যোগী?

যোগী মনিবের গমনপথের দিকে চাহিয়া বলিতেছিল, মা তোমার জন্মের সময় মধু মুখে দেয় নাই, দিয়েছিল বিষ!

বিভা আবার ডাকিল, যোগী!

যোগী ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিল, এই যে হাত-মুখ ধুয়ে আসি দিদিমণি।

ভাঁড়ার-ঘরের শিকল খুলিতে খুলিতে বিভা কহিল, একবার জেলেপাড়াটা ঘুরে আসবে তো যোগী! পোয়া-টাক মাছ কিনে আনবে তো!

ঠোঁটের ডগায় আওয়াজ করিয়া যোগী কহিল, হুঃ, তোমারও যেমন দিদিমণি!

সকালবেলা হইতেই বাঁড়ুজ্জে আসর জমাইয়া বসে। রাধু কামার, গোলাম মোড়ল, জগা নাপিত, রহিম সেখ, সুরেশ মিশ্র, হরাই মজুমদার প্রভৃতি ভিড় করিয়া বসিয়া থাকে। বাঁড়ুজ্জে আরম্ভ করে, আমি আর রাখতে পারব না রাধু। তোমাকে

আমি বার বার করে আজ দু বছর ধরে বলে আসছি, তুমি কর্ণপাতই করছ না। কেন বল দেখি? তুমি আমাকে মনে করেছ কি? দাতাকর্ণ, না গৌরী সেন? কিন্তু যদি আমাকে নালিশ করতে হয় তবে সূচ্যগ্র মেদিনী তোমার রাখব না আমি। তোমাকে ভাঁড় হাতে করে ভিক্ষা করাব আমি—সে বলে রাখছি। যত বেটা বদমাশ বাটপাড়ের পাল্লায় পড়ে মাটি হলাম আমি। সেবার বললে তুমি, এই মাসের মধ্যে টাকা দেবে। তোমার কথায় বিশ্বাস করে—

অকস্মাৎ বাঁড়ুজ্জের গলা উগ্র হইয়া উঠে। সে বলিয়া যায়, এ সংসারে যার বাতের ঠিক নেই, তার জাতের ঠিক নেই, তা জান? যোগে, ওরে বেটা হারামজাদা শুয়ার, তামাক দে রে বাপু। এতগুলো ভদ্রলোক বসে আছে, বেটা, ডেবা-ডেবা চোখে দেখতে পাও না?

মজলিশ গমগম করিতে থাকে। যোগী হুঁকা-কলিকাটা আগাইয়া দেয়। সে তামাকই সাজিতেছিল।

বাঁড়ুজ্জে কহিল, কলার পোটো আন দেখি গোটা তিনেক! ভদ্রলোক কি হাতে তামাক খাবে রে বেটা চাষা?

হুঁকাটা সুরেশ মিশ্রের হাতে দিয়া আপ্যায়িত করিয়া সে কহিল, খান গো মিচ্ছি মশায়, তামাক খান!

তারপর আবার ধরিল রাধুকে, তুমি একটা মানী লোক—ভদ্রলোক। তোমার অপমান আমি করতে পারব না। নালিশ করে যে কাঠগড়ায় দাঁড় করাব তোমাকে, সে আমা হতে হবে না। কিন্তু আমারও তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে, না কি মিচ্ছি মশায়?

সুরেশ তামাক টানিতে টানিতে কহিল, তা তো বটেই। আপনার খেয়াও তো ঘর ঢোকাতে হবে। ন্যায্য টাকা। মিষ্টি কুলের আঁটিসুদ্ধ গিললে চলবে না।

রাধু কামারকে চিন্তার অবসর দিয়া বাঁড়ুজ্জে ধরিয়া বসিল গোলাম মোড়লকে। যেন তাহার সহিত অকস্মাৎ দেখা, এমনিই ভঙ্গি করিয়া কহিল, ওই, গোলাম মোড়ল যে হে! অ্যাঁ, এ কি ভাগ্যি আমার! আজ সুয্যি কোন দিকে উঠেছে বল দেখি? তারপর কী মনে করে আসা হল মোড়ল মশাই?

গোলাম নতচক্ষে অকারণে একটা কাগজ লইয়া ভাঁজিতেছিল, সে চুপ করিয়া রহিল। বাঁড়ুজ্জে ঘাড় উঁচু করিয়া চশমাসুদ্ধ দৃষ্টিটা তাহার উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, কথা কও না যে হে? বলি, কথা কও না যে? কথার উত্তর দিতে হবে না কি? না, তোমার রূপ দেখলেই আমার পেট ভরবে?

গোলাম মৃদু হাসিয়া কহিল, এসে কি করব বলুন ? টাকাকড়ি যোগাড় না হলে আমাকে দেখে তো আপনার পেট ভরবে না। আর আমাকে এত তাড়াতুড়িই বা কেন মশাই ? আমাকে দেখে তো আপনি টাকা দেন নি, দিয়েছিলেন আমার জমি দেখে। সে জমি তো আপনার খতে বন্ধক দেওয়াই আছে।

বাঁড়ুজ্জে অবাক হইয়া গেল। এমন উত্তর সে প্রত্যাশা করে নাই। বিস্ময়ের ঘোরটুকু কাটাইতেই সে অকস্মাৎ লাফাইয়া উঠিল, কহিল, বলি, খতে থাকলেই আমি বর্তে গেলাম আর কি ! জমি তুমি আমাকে কবলা করে দাও হে বাপু। তুমি যে দিব্যি জমি ভোগ করে যাচ্ছ, তার কি ?

গোলাম কহিল, তা আজ্ঞে যদ্দিন খেয়ে নিতে পারি সেই আমার লাভ। আপনি জমি দখলে নেবার ব্যবস্থা করুন, তাতে আইনে আমি যদ্দিন সময় পাই।

বাঁড়ুজ্জে গর্জিয়া উঠিল, বডি ওয়ারেণ্ট করব তোমায় আমি।

তত্‌ক্ষণে গোলাম রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছে।

ইহার পরই একটা প্রলয় ঘটিবার কথা। কিন্তু তাহার পূর্বেই ওপাশের দরজার পাশ হইতে ডাক আসিল, মামা !

সমস্ত রাগটা তৎক্ষণাৎ বিভার উপর গিয়া পড়িল, দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বীভৎস ভঙ্গিতে বাঁড়ুজ্জে কহিল, কি ? বলছ কি ? মামা ! মামা ! শুভকর্মেও পেছু থেকে —মামা ! মন্দেও তাই ! ভালা বিপদে পড়েছি আমি !

এতগুলা লোকের সমক্ষে এমন ধারা বীভৎস অপমানে বিভার মাথাটা হেঁট হইয়া গেল। অবরুদ্ধ কান্নায় তাহার ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। উত্তর দিতে সে পারিল না।

উপস্থিত লোকগুলিও বোধ করি এখানে উপস্থিতির জন্য মৌনভাবেই অপরাধ বোধ করিতেছিল। তাহারা যে যাহার চোখের নীচের মাটিটুকুর উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাঁড়ুজ্জে আবার খিঁচাইয়া উঠিল, বলি, বলছ কি শুনি ?

বিভা কোনোরূপে বলিয়া ফেলিল, মা কেমন করছেন।

কেমন করছে ? বলি, কী করছে, অ্যাঁ ?

অসুখ বেড়েছে মনে হচ্ছে। কথা কইতে পারছেন না।

বিভার চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল। বাঁড়ুজ্জে বিবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিল, সে কি রে বাপু ? কথা কইতে পারছে না কি রে বাপু ? তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। ঘুমিয়েছে হয়তো। ডেকে দেখেছিস ?

ডেকে দেখেছি। উত্তর দিতে পারলেন না। ইশারা করে দেখালেন বড় কষ্ট হচ্ছে।

অ্যাঁ, সে কি রে বাপু? এ আমি কি করি বল দেখি? যোগে, ও যোগে, যা তো ডাক্তারের কাছে একবার। ওগো, তোমরা এস বাপু এখন। আমার বিপদ তো দেখছ! যোগে, গেলি রে, ও যোগে!

বিভার মায়ের অসুখ সত্যসত্যই কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কহিলেন, তাই তো, এ যে দেখছি নিউমোনিয়া ডবল সাইড নিয়ে বসে আছে।

বাঁড়ুজ্জে ডাক্তারের পাশে দাঁড়াইয়া মনের চাঞ্চল্যে ক্রমাগত দুলিতেছিল!

সে মৃদুস্বরে বারবার প্রশ্ন করিতেছিল, হ্যাঁ ডাক্তার, বলি, বাঁচবে তো? ডাক্তার, বলি বাঁচবে, না কি, বল না হে?

ডাক্তার কহিল, বলা তো যায় না। অবস্থা বড় খারাপ হয়ে পড়েছে। এখন তাড়াতাড়ি ওষুধ আনতে লোক পাঠিয়ে দিন। বুকে দেবার জন্যে এক কৌটো অ্যান্টিফ্লজেস্টিন।

বাধা দিয়া বাঁড়ুজ্জে বলিল, কেন, আমাদের মসনের পুলটিস?

ডাক্তার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, মসনের পুলটিসও ভালো জিনিস; কিন্তু এ অবস্থায় অ্যান্টিফ্লজেস্টিন দেওয়াই ভালো।

ঘরের ভিতর হইতে ডাক আসিল, মামা!

দরজার গোড়ায় গিয়া বাঁড়ুজ্জে কহিল, কী?

দুইটি টাকা হাতে দিয়া বিভা বলিল, ডাক্তারের ফী।

বাঁড়ুজ্জে বাহিরে আসিয়া ডাক্তারকে বলিল, এস ডাক্তার, এস। তা হলে ওষুধটা ভাই, তাড়াতাড়ি দিও যেন!

বাড়ির বাহিরে আসিয়া ডাক্তারের হাতে একটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, কিছু বলতে পাবে না ভাই, বড় গরিব, আমাকে নিজে থেকে, হেঁ-হেঁ, বুঝতেই তো পারছ?

ডাক্তার আপত্তি করিল না। নমস্কার করিয়া বলিল, ওষুধের জন্যে লোক পাঠিয়ে দিন। আর যদি দরকার হয়, তবে আবার ডাকবেন আমায়, বুঝলেন?

বাঁড়ুজ্জে সবিনয়ে কহিল, মঙ্গল হবে ভাই, মঙ্গল হবে তোমার।

বিভা দরজার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, মামা বাড়ি ঢুকিতেই সে উৎকণ্ঠিতভাবে কহিল, ডাক্তার কি বললে মামা?

বাঁড়ুজ্জের জিভের আগায় আসিয়া পড়িয়াছিল স্বভাবসিদ্ধ একটা কটু কথা— বলবে আবার কি? বলছিল আমার মাথা, শিঙে ফুঁকবে আর কি! কিন্তু বিভার

মুখের দিকে চাহিয়া সে কেমন হইয়া গেল। আশঙ্কায় তাহার মুখখানি ম্লান হইয়া গেছে, বড় বড় চোখ দুইটি আসন্ন অশ্রুভারে ছলছল করিতেছিল।

বাঁড়ুজ্জে চেষ্টা করিল স্বাভাবিকভাবে হুড়মুড় করিয়া একটা জবাব দিতে; কিন্তু তাও সে পারিল না। অবশেষে যাহা সে কহিল তাহা তাহার পক্ষে অতি অস্বাভাবিক। অতি মিষ্ট ভাষায় বলিয়া উঠিল, ভয় কি রে আমি থাকতে? ভালো হয়ে যাবে দিদি। কেন, বুকে কি সর্দি বসে না কারু?

বিভা কিন্তু আকুল হইয়া উঠিল। মামার এই অস্বাভাবিক সান্ত্বনার স্বরে বুক তাহার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সে বুঝিল, অতি বড় দুর্ভাগ্য মাথায় করিয়া পৃথিবীর বুকে সে আজ করুণার পাত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই এই অযাচিত সান্ত্বনা তাহার ভাগ্যে মিলিল।

রুদ্ধ রোদন সংবরণ করিতে করিতে উপরে ছুটিয়া উঠিয়া গেল। মায়ের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বারবার সে ডাকিল, মা মা—মাগো—মা!

মা তখন বিড়বিড় করিয়া আপনার কথা কহিতেছিল, সে কথার অর্থও হয় না, বোঝাও যায় না। চোখের জলে বিভার মুখ বুক ভাসিয়া গেল। কতক্ষণ পর বাঁড়ুজ্জে আসিয়া সন্তর্পণে ডাকিল, বিভা!

আঁচলে চোখ মুছিয়া বিভা মামার দিকে চাহিল।

মৃদুস্বরে মামা বলিল, ওষুধ।

একটা শিশি ও অ্যান্টিফ্লজিস্টিনের কৌটাটা নামাইয়া দিল। তারপর আবার কহিল, এক দাগ ওষুধ দে, পেটে পড়ুক। আর এই কৌটোটার ওষুধ কি করে লাগাতে হবে জানিস তুই?

বিভা ঔষধ ঢালিতে ঢালিতে কহিল, জানি, জল গরম করতে হবে। তুমি একটু এখানে বসবে মামা? আমি জলটা—

তাড়াতাড়ি বাঁড়ুজ্জে বলিল, জল গরম যোগে করবে। আমি বলে দিচ্ছি, বেটা হারামজাদা চাষা খাবে আর দিনরাত বসে থাকবে!

বিভা বলিল, তা বেশ। তুমি একবার ধরে দেবে তা হলে বাঁধবার সময়?

সিঁড়ির মুখে পা বাড়াইয়া মামা কহিল, আমি ওই কুসুম-ঠাকরুনকে ডেকে দিচ্ছি, সেই ধরে দেবে, বুঝলি?

তাড়াতাড়ি সে নামিয়া আসিল, হাত-পা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

যোগীকে ডাকিয়া জল গরম করিতে বলিয়া অকস্মাৎ সে বলিয়া ফেলিল, কি করি বল দেখি যোগী? আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। আমি বাপু, মানুষ মরে তাই শুনেছি, চোখে কখনও দেখি নি।

খবর পাইয়া পাড়া-প্রতিবেশীর দল ভিড় করিয়া আসিয়াছিল। জনকতক পুরুষমানুষ বাঁড়ুজ্জেকে লইয়া বাহিরের দাওয়ার উপর ভিড় করিয়া বসিয়া ছিল।

উপরে আর একদল প্রতিবেশিনী নিঃশব্দে রোগিণীকে ঘিরিয়া বসিয়া ছিল। বিবর্ণ কঙ্কালাবশেষ নারীদেহখানি বিছানার উপর অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। অতি-শীর্ণতায় সম্মুখের দাঁতগুলি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। চোখের দৃষ্টি অস্থির, অর্থহীন।

বিভা শুধু মৃদুরবে কাঁদিতেছিল, আর মাঝে মাঝে কাতর স্বরে সংজ্ঞাহীনা মাকে প্রশ্ন করিতেছিল, মা মা, কোথা চললে মা? মাগো!

বর্ষীয়সী মেয়েদের মধ্যে সরকার-গিন্নী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আর কোথা চললে মা! মা চলেছে পথে, মা!

কুসুম-ঠাকরুন চোখ মুছিয়া কহিলেন, আহা-হা, কি যে তোর হল মা!

সরকার-গিন্নী বলিলেন, উপায় কি মা! এ এড়াবার তো পথ নেই। থাকলে কি মানুষ ছাড়ত!

নিদারুণ আক্ষেপ সহকারে শ্যামা পিসী কহিলেন, এ-ই—তা হলে কি মানুষ ছাড়ত? ছাড়ত না। মানুষের বেঁচে আশ মেটে না। এই আমাকে দেখ, স্বামী গেছে, পুত্তুর গেছে, কে আছে মা সংসারে আমার? তবু তো মরতে পারি না। রোগ হলে ওষুধ খাই। সাপ দেখে ভয় হয়।

বিভা মায়ের মুখে বড় সমাদরে হাত বুলাইতেছিল।

সহসা রোগিণীর গলার ডাকটা অনুরূপ ধারণ করিল। নাভির প্রান্ত হইতে গোটা বুকটা স্পন্দিত হইতে আরম্ভ হইল। বেনেদের গিন্নী এক কোণে বসিয়া ছিল, সে পার্শ্ববর্তিনীর গা টিপিয়া কহিল, মহাশ্বাস আরম্ভ হল।

পার্শ্ববর্তিনী মনোযোগসহকারে দেখিতেছিল, সে কহিল, না।

না? দেখ ভালো করে তুমি।

সরকার-গিন্নী মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, দাও মা বিভা, মায়ের মুখে দুধ গঙ্গাজল দাও। কেঁদো না মা, কেঁদো না। এ সময়ে সন্তানের যা কাজ তাই কর। তারপর কাঁদবে বইকি, গোটা জীবনই যে তোমার কাঁদবার জন্যে রইল।

টপটপ করিয়া কয় ফোঁটা জল সরকার-গিন্নীর গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

বাহিরের ঘরে বাঁড়ুজ্জে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। উপস্থিত ভদ্রলোকের একজন বলিলেন, একবার দেখে এলে না কেন মহিম?

বাঁড়ুজ্জে চমকিয়া উঠিল, এরূপ আদেশ সে প্রত্যাশা করে নাই। কহিল, আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ। তুমি বই আর কে আছে, বল?

সকাতর ব্যগ্রতায় বাঁড়ুজ্জে বলিয়া উঠিল, আপনারা আছেন। কে আছেন বলছেন কেন ?

তা বটে, সে একশো বার, মানুষ ছাড়া মানুষের কে আছে বল ? তবে তোমার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ।

বাঁড়ুজ্জেকে আর দেখিতে হইল না। বিভার মর্মভেদী আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, মা, কোথায় গেলে গো মা !

বাঁড়ুজ্জে ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, যাঃ, হয়ে গেল !

নিমেষে মৃত্যুর অনিবার্যতা সকলের কাছেই সুপ্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। একজন গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একান্ত আন্তরিকতার সহিত বলিয়া উঠিল, এই মানুষের জীবন !

একজন বলিল, পদ্মপত্রে জল রে ভাই, এই আছে এই নাই।

মনের চিন্তা এমন ক্ষেত্রে গোপন থাকে না, একজন বলিয়া ফেলিল, কোথায় যে যায় মানুষ !

ওই চিন্তাটাই বোধ হয় সকলকে পাইয়া বসিল, সকলেই নীরব হইয়া গেল।

অকস্মাৎ একজন কহিল, এই ক দিনের জন্যে মানুষ মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া-ঝাঁটি, আমার ঘর, আমার দোর, আমার ছেলে, কতই না করে !

সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একজন বলিয়া উঠিল, হরিবোল—হরিবোল !

বৃদ্ধ একজন বলিলেন, ওই সত্যি রে ভাই, হরিনামই সত্য। হরিবোল! হরিবোল !

আবার কিছুক্ষণ সব নীরব। বোধ হয় ওই নামকেই জড়াইয়া ধরিতে সকলে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু ধরা যায় না।

একজন বলিয়া উঠিল, এদিকের যোগাড় করুন সব। বেলাও আর বেশি নেই।

বাঁড়ুজ্জে জোড় হাত করিয়া বলিল, যা করতে হয় করুন আপনারা। আমি তো বিদেশী, আর ওরা তো আপনাদের চিরকালের আশ্রিত।

যা যা কিনতে কাটতে হবে, সেগুলো সব—তারপর বাঁশ, কাঠ—

বাঁড়ুজ্জে বলিয়া উঠিল, যা লাগবে বলুন। আমি টাকা দিচ্ছি। আমি তো রয়েছি, আমার দিদি।

একশো বার। লোকে আত্মীয় বন্ধু কামনা করে কেন তবে ? টাকাপয়সার প্রয়োজন কি ? সে কি সঙ্গে যায় ?

বাঁড়ুজ্জে আপনার মনে কত চিন্তাই করিতেছিল, অভিভূতের মতো সে বলিয়া উঠিল, এই তো মানুষের জীবন ! অ্যাঁ ? এর জন্য এত ? টাকা বিষয়, ধন দৌলত, আত্মীয় স্বজন, কিছুই না, কিছুই সঙ্গে যায় না ! হায় ! হায় ! হায় !

ওদিকে বিভা বুক ফাটাইয়া কাঁদিতেছিল, মা মা, কোথায় গেলে মাগো!

স্থিরচক্ষু, বিবর্ণ, নিস্পন্দ শবের বুকে সে বার বার আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল। উপস্থিত সকলের মুখ ম্লান, চোখ ছলছল করিতেছে। এইটুকু মিথ্যা নয়, ক্ষণিকের জন্যও এ সত্য।

সরকার-গিন্নী সুগভীর আক্ষেপের স্বরে কহিলেন, মা আর উত্তর দেবে না, মা। এ জীবনে মা বলা তোর হয়ে গেল।

শ্যামা পিসী বলিলেন, নাই বললে আর নাই, মা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে আর মিলবে না। আর মানুষ কেমন পাষাণ দেখ, দু দিন পরে আবার খাবে, মাখবে, হাসবে, যে-কে-সেই।

কুসুম-ঠাকরুন কহিলেন, মায়া, মায়া, মহামায়ার মায়া।

নীচে দাওয়ার উপর বসিয়া মেয়েগুলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিল। অনেকের চক্ষে জলও দেখা দিয়াছে। ওপাশে রান্নাঘরের দাওয়ায় যাহারা ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া বসিয়া ছিল, তাহাদের মুখেও ম্লান ছায়া।

দূরের কোলাহল যেমন ভাসিয়া আসিতেছিল, তেমনই আসিতেছে। এ ঠিক যেন একখানি ভাসা মেঘের ছায়া। মেঘখানির প্রান্তসীমা বহিয়া সূর্যালোক চারিপাশে ঝক-মক করিতেছে।

জনকয়েক পুরুষ আসিয়া বাড়ি ঢুকিল। ইহারা শববাহক। অপরাধীর মতো তাহারা চলিয়াছিল। এ উহাকে আগাইয়া দেয়, সে পিছাইয়া আসিতে চেষ্টা করে, অপর একজনকে সম্মুখে ঠেলিয়া দেয়।

অল্পক্ষণ পরেই বিভার আর্তনাদ মর্মান্তিক হইয়া উঠিল। উপরের মেয়েরা দ্রুতপদে নামিয়া আসিয়া একপাশে দাঁড়াইল। নীচের মেয়েরা পথ পরিসর করিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

উপরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, বল হরি, হরিবোল।

বিভা বুক ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো, মাকে আমার নিয়ে যেও না গো! ওগো, মাগো!

কে কহিল, শেকল দিয়ে দাও, দরজায় শেকল দিয়ে দাও।

শিকল দেওয়ার শব্দের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শববাহকেরা শব লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। ঘরের মধ্যে বিভা তখন আর্তনাদ করিতেছিল, ওগো, আমাকে আর একবার দেখতে দাও গো! আর তো দেখতে পাব না আমি মাকে।

বাঁড়ুজ্জের বুকটা কেমন করিয়া উঠিল, সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল। শিকল খুলিয়া বিভাকে সঙ্গে লইয়া নীচে নামিয়া আসিল, কহিল, দেখ, দেখে নে। কী করবি বল, এ তো তোর নতুন নয় মা!

বিভা কাঁদিয়া কহিল, মা, আমাকে কার কাছে রেখে গেলে মাগো?

নিবিড় স্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বাঁড়ুজ্জে বলিল, ভয় কি মা বিভা! আমি রইলাম, আমি তোর ছেলে, আমি তোর মা হব।

তাহারও চোখ দিয়া দরদর ধারে জল ঝরিতেছিল।

শব কাঁধে লইয়া বাহকেরা হরিবোল দিয়া উঠিল। সমবেত সকলেই বলিয়া উঠিল, হরিবোল—বল হরি।

একজন বাহক কহিল, বাঁড়ুজ্জে, জিনিসপত্র সব নিয়ে এস।

অপর একজন মনে পড়াইয়া দিল, পাঁজির পাতা এন, মন্তর আছে যে পাতায়।

কাঠ নিয়েছ? খড়?

আমাদের কাপড় আর জলখাবার?

আর একজন কহিল, শোন হে, আর একটা কথা বলে দিই।

বাঁড়ুজ্জে অগ্রসর হইয়া আসিল। বক্তা ফিসফিস করিয়া বলিয়া দিল, আধ ভরি গাঁজা আর একটা বোতল—বুঝেছ? শ্মশানে না হলে চলে না। কথাটা শেষ করিয়াই হাঁকিয়া উঠিল, বল—হ—রি—

অপর সকলে সমস্বরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল, হ—রি—বোল।

শব চলিয়া গেল।

মেয়ের দল সন্তর্পণে বাহির হইয়া গেলেন। শ্যামা পিসী অকস্মাৎ সরকার-গিন্নীকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, মড়ার খড় পড়ে রয়েছে যে!

সরকার-গিন্নী কহিলেন, ছোঁয়া তো পড়েছেই—

শ্যামা পিসী চমকিয়া উঠিল, তুমি ছুঁয়েছ নাকি? তোমার বাপু সবই বাড়াবাড়ি। আমি ছুঁই নি। এই অবেলায় চান করে অসুখ-বিসুখ হলে কে দেখবে মা আমাকে? দেখ দেখি হাঙ্গামা!

বেনে-গিন্নী বলিল, মরণের পেহার দেখলে?

শ্যামা পিসী শিহরিয়া উঠিল, আমরা যে কি করে যাব মা, তাই ভাবি!

বিভার আর্তনাদ শোনা যাইতেছিল। কুসুম-ঠাকরুন মুখ বাঁকাইয়া কহিল, আবার কেন? ঢের কেঁদেছিস বাপু, আর কাঁদা আদিখ্যেতা।

অল্পবয়সী একজন অকস্মাৎ বলিল, এক কুঁদুলী গেল কিন্তু!

জনকতকের মুখে অল্প মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া বাঁড়ুজ্জে ভট্টাচার্যকে লইয়া শ্রাদ্ধের ফর্দ করিতেছিল। ত্রিরাত্রির শ্রাদ্ধ, সময় আর মাত্র দুইটি দিন। অবসন্ন শরীরে বাঁড়ুজ্জে শুইয়া ছিল। ওদিকে বিভার মৃদু ক্রন্দনধ্বনি শোনা যাইতেছিল।

ভট্টাচার্য বলিলেন, যেমন করবেন, তিলকাঞ্চনে শ্রাদ্ধ করলে অল্পেই হবে।

বাঁড়ুজ্জে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নাঃ, খরচ কম-বেশিতে কি যায় আসে! বৃষোৎসর্গই হবে। একটা মানুষই গেল জন্মের মতো, আর কটা টাকা!

ভট্টাচার্য বাঁড়ুজ্জেকে জানিত, সে তাহার মুখের দিকে চাহিল, অবশেষে কহিল, দেখুন মেয়েমানুষ, তার মতটা একবার—। আর সে পাবেই বা কোথায়?

মহিম চটিয়া উঠিল, সে খবরে আপনার দরকার কি মশাই? টাকা? টাকার ভাবনা তাকে ভাবতে হবে কেন শুনি? যে মরেছে সে তো শুধু মেয়েটিকে রেখে মরে নি। আমি তার ভাই, আমি দেব, আমি করব সব।

ভট্টাচার্য অবাক হইয়া গেল।

বাঁড়ুজ্জে কহিল, এ কি একটা বালিকা মরেছে যে তিলপাত্র কাজ হবে? টাকা, কত টাকা লাগবে শুনি? টাকা নিয়ে করব কি? এ সময়ে যদি কাজে না লাগে, সে টাকার দাম কি?

ভট্টাচার্য বলিল, তা তো বটেই।

বাঁড়ুজ্জের মনের আবেগ তখনও শেষ হয় নাই, ভট্টাচার্যের কথায় বাধা দিয়া সে বলিয়া গেল, এই তো মানুষের জীবন! এর মধ্যেও যদি ধর্মকর্ম—

বাহির হইতে কে ডাকিল, বাঁড়ুজ্জেমশায়!

বিরক্তিভরে বাঁড়ুজ্জে কহিল, কে?

যোগী বলিল, রাধানগরের মুকুন্দ পাল।

বাঁড়ুজ্জে বলিয়া দিল, বলে দে আমার শরীর ভালো নেই আজ। আঃ, লোকেও যে দুদিন অবসর দেবে না! সেই পঙ্কে টেনে ফেলবেই।

তবুও মুকুন্দ ঘরে আসিয়া বসিল, কহিল, আমার কাজটা—

এক রকম বাধা দিয়া বাঁড়ুজ্জে বলিল, গতকাল আমার দিদি মারা গেলেন বাপু, কথাবার্তা কইবার মতো মনের অবস্থা নয় আমার আজ। আজ এস তুমি।

সবিনয়ে মুকুন্দ কহিল, আজ্ঞে, টাকাটা আমি যোগাড় করে এনেছি, বাড়িতে রাখলে ভেঙে যায়, কিছু হয়—

অগত্যা বাঁড়ুজ্জে উঠিয়া কহিল, টাকা এনেছ? তা হলে দিয়ে যাও!

মুকুন্দ কতকগুলি টাকা শতরঞ্জির উপর নামাইয়া দিল। টাকাগুলি না গুনিয়া বাঁড়ুজ্জে মুকুন্দের মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিল, আর?

বাঁড়ুজ্জের পা দুইটি জড়াইয়া মুকুন্দ কহিল, পঞ্চাশ টাকা আর আমি দিতে পারব না। এই নিয়ে আমাকে রেহাই দিতে হবে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বাঁড়ুজ্জে কহিল, পা ছাড় মুকুন্দ, তাই হল। তোমাকে দলিলখানা ফেরত দিই, নিয়ে যাও।

যোগী ভট্টাচার্যকে একান্তে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ভট্চাজ মশাই, মরবার আগে শুনেছি নাকি মানুষের মতিগতি সব পালটিয়ে যায়, এ কি সত্যি ?

ভট্টাচার্য কহিল, কত রকম হয়। কারু নাক বেঁকে যায়, কেউ অরুন্ধতী দেখতে পায় না; কেউ চোখের নীলতারা দেখতে পায় না; আরও কত লক্ষণ আছে।

শ্রাদ্ধশান্তি সমারোহের সহিতই হইয়া গেল। বাঁড়ুজ্জের সুযশে গ্রামখানা ভরিয়া গেল, শক্রতেও সবিস্ময়ে কহিল, ব্যবহার না করলে মানুষ চেনা যায় না। এই তো মহিম বাঁড়ুজ্জের নাম সকালে কেউ করত না, তার কাজ দেখ!

দিন যায়।

ক্রমশ আবার বাঁড়ুজ্জের মজলিশ জমিয়া উঠে।

কিন্তু কে জানে কেন অতি মাত্রার সে রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন জগাই মজুমদার দশটি টাকা কম দিয়া কহিল, আর আমি পারব না ভাই, এতেই আমাকে মাপ দিতে হবে। ভিক্ষে চাইছি আমি।—সকাতরে সে বাঁড়ুজ্জের হাতটি জড়াইয়া ধরিল।

অতি রূঢ়ভাবে বাঁড়ুজ্জে হাতখানা টানিয়া লইল। টাকাগুলা ঝনঝন শব্দে ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল। বিকৃত ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, এতেই আমাকে মাপ দিতে হবে? মাইরি আর কি! কেন, কেন, দশ টাকা কম নেব কেন আমি, শুনি? আমি কি মাগনা চাইছি, না ভিক্ষে চাইছি হে বাপু? ও সব হবে না, এক কপর্দক আমি ছাড়ব না।—বলিয়া সে নিজেই আবার টাকাগুলি কুড়াইয়া লইল। অপমানে ক্ষোভে মজুমদারের চোখ ফাটিয়া মুহুর্মুহু জল আসিতেছিল, সর্বংসহা ধরিত্রীর বুকের দিকে চাহিয়া সে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিতেছিল।

বাঁড়ুজ্জে খতখানা বাহির করিয়া দিয়া কহিল, উসুল দিয়ে দিন পিঠে। দশ টাকা বাকি থাকছে, টাকা দিয়ে খত নিয়ে যাবেন।

মজলিশ ক্রমে ক্রমে চুকিয়া গেল। কাগজপত্র গুটাইয়া রাখিয়া বাঁড়ুজ্জে শতরঞ্জির উপর শুইয়া পড়ল। অকস্মাৎ আবার উঠিল, একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া আবার দেখিতে বসিল। যোগীকে ডাকিয়া বলিল, তামাক দে তো যোগে!

ফর্দখানা বিভার মায়ের শ্রাদ্ধের।

সমস্ত অঙ্ক যোগ করিয়া পরিশেষে সর্বমোট খরচের দিকে চাহিয়া ছিল। সে অঙ্কটার পরিমাণ হইতেছে—পাঁচ শত পঞ্চাশ টাকা কয়েক আনা।

যোগী হুঁকা-কলিকা আগাইয়া দিল। হুঁকাটা লইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাঁড়ুজ্জে কহিল, ঘাড়ে ভূত চেপেছিল আমার, অনর্থক এই পাঁচ-পাঁচশো টাকা—

যোগী চুপ করিয়া রহিল।

বাঁড়ুজ্জে আবার কহিল, এদের খেয়েছি আর কত? জোর না হয় দশ-পনেরো টাকা! তুই তো আমাকে কিছু বললি না যোগী? কি যে তখন হল আমার!

হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া আবার কহিল, তুই একবার বলিস কেন যোগী, বিভাকে। ওদের গয়না-টয়নাও তো আছে। সব আমাকে লাগানো কি—। হ্যাঁ। একবার রাধানগরের মুকুন্দকে ডাকবি তো! বেটার কাছে পঞ্চাশ টাকা পেতে হবে এখনও।

ভিতরের পাশের দরজার কাছে কিসের শব্দ শুনিয়া বাঁড়ুজ্জে চুপ করিয়া গেল।

বিভা ডাকিল, মামা, খাবে এস।

রাত্রে বাঁড়ুজ্জের আসনের সম্মুখে ভাতের থালা নামাইয়া দিয়া বিভা কহিল, মামা!

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বাড়ুজ্জে কহিল, কি?

কোনোমতেই সে এই হতভাগা মেয়েটাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না।

বিভা কহিল, মা তাঁর শ্রাদ্ধের জন্যে কখানা গয়না রেখেছিলেন। সে কখানা তো তাঁরই শ্রাদ্ধে দিতে হয়। এ কখানা বেচে যা হয়—

ছোট একটি পুঁটুলি কাপড়ের আঁচল হইতে বাহির করিয়া সে সম্মুখে নামাইয়া দিল। বাঁড়ুজ্জে তাড়াতাড়ি বাঁ হাতে তুলিয়া সেটার ওজন অনুমান করিয়া খুশি না হইয়া পারিল না।

ও বারান্দায় বিভা যোগীকে ভাত দিতেছিল।

যোগী মৃদুস্বরে ভৎর্সনা করিয়া কহিল, কি ছেলেমানুষি করলে দিদিমণি?

বিভা কোনো উত্তর দিল না, শুধু একটা সকরুণ হাসি তাহার অধরে ফুটিয়া উঠিল।

যোগী কহিল, শোক চিরদিন থাকে না দিদিমণি।

নুটু মোক্তারের সওয়াল

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের সমারোহের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের সূচনা হইয়াছিল, ত্রেতায় লঙ্কাকাণ্ডের সূচনাও রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সমারোহের মধ্যে। পুষ্পদলের মর্মস্থলনিবাসী কীটের মতো এক-একটা সমারোহের আনন্দকোলাহলের অন্তরালে লুকাইয়া থাকে অশান্তির সূচনা। কঙ্কণা গ্রামেও একটি অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়া গেল। কঙ্কণা গ্রামের ধনী অধিবাসীদের দানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারই উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের সমারোহ উপলক্ষে নুটু মোক্তারের সহিত কঙ্কণার বাবুদের বিবাদ ঘটিয়া উঠিল।

বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম কঙ্কণার ধনের প্রসিদ্ধি এ দেশে বহুবিস্তৃত এবং বহুপ্রসিদ্ধ। দূর হইতে কঙ্কণার দিকে তাকাইলে কঙ্কণাকে পল্লীগ্রাম বলিয়া মনে হয় না, কোনো বিশিষ্ট শহরের অভিজাত পল্লী বলিয়া মনে হয়। বহুকাল হইতে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে কঙ্কণায় মা-লক্ষ্মী বাঁধা আছেন। কোন অতীতকালে মা-লক্ষ্মী ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন; সহসা তাঁহার হাতের কঙ্কণ খসিয়া পথের ধূলার মধ্যে পড়িয়া যায়, সেই কঙ্কণের মমতায় আজও তিনি কঙ্কণা গ্রামের মধ্যে ঘুরিতেছেন। কঙ্কণ হইতেই গ্রামের নাম কঙ্কণা।

প্রবাদ চিরকাল প্রবাদই, কিন্তু প্রবাদ রটিবার একটা হেতু সর্বত্রই থাকে, এ ক্ষেত্রেও হেতু একটা আছে। কঙ্কণা গ্রামের মুখুজ্জেরা বাংলা দেশের মধ্যে খ্যাতিমান ধনী। বাংলার বহু স্থানেই তাঁহাদের টাকা ছড়ানো আছে। বহু জমিদার-পরিবারই মুখুজ্জেদের ঋণদায়ে আবদ্ধ। তাহার উপর মুখুজ্জেরা নিজেরাও জমিদার।

মুখুজ্জে-পরিবার এখন জনে বহুবিস্তৃত, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের ধনের পরিমাণ কমে নাই। সন্ততিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুদও সমানে বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকে অবশ্য বলে, মুখুজ্জদের সিন্দুকে টাকার বাচ্চা হয়, কিন্তু সেটাও প্রবাদ। কঙ্কণার বাবুদের সুদের কারবার লক্ষ লক্ষ টাকার।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এমন একখানি ধনীর গ্রাম, তবুও গ্রামের মধ্যে না আছে স্কুল, না আছে ডাক্তারখানা, এমন কি হাট-বাজার পর্যন্ত নাই। থাকিবার মধ্যে আছে খান দুই মিষ্টির দোকান, কিন্তু মুড়ি-মুড়কি মণ্ডা-বাতাসা ছাড়া আর কোনো কিছু দোকানে পাওয়া যায় না। অন্য কোনো মিষ্টান্ন রাখিতে বাবুদের নিষেধ আছে, দোকানীরাও রাখে না।

বাবুরা বলেন, মিষ্টি থাকলেই ছেলেরা খাবে, আর মিষ্টি খেলেই ছেলেদের পেটে কৃমি হবে।

দোকানী বলে, আজ্ঞে, সবই ধার, রেখে কী করব বলুন? খাজনায় আর কত কত কাটানো যাবে। তা ছাড়া আমার দোকানে বাকি বাড়লে বাবুদের খাতায় খাজনার সুদ বাড়বে।

হাটের কথায় কঙ্কণার বাবুরা বলেন, হাট তো হল লক্ষ্মী নিয়ে বেসাতি! মা-লক্ষ্মী চঞ্চলা হবেন যে! স্কুলের কথায় তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, বলেন, সর্বনাশ! মায়ের সতীন ঘরে আনব? ছেলেরা বাইরে লেখাপড়া শিখে আসুক, কিন্তু কঙ্কণায় সরস্বতীর আসন বসানো হবে না।

ডাক্তারখানার বিরুদ্ধেও এমনই ধারা যুক্তিতর্ক নিশ্চয় প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে যুক্তি-তর্ক জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট টিকিল না। সাহেবের আদেশে বাবুদের চাঁদায় কঙ্কণায় এক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

সেই দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধনের দিন। সে এক মহাসমারোহের অনুষ্ঠান। ডাক্তারখানার নূতন বাড়িখানির সম্মুখেই চাঁদোয়া খাটাইয়া দেবদারুপাতা ও রঙিন কাগজের মালায় মণ্ডপ সাজানো হইয়াছে। থানার জমাদারবাবু হইতে জেলার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সকলেই আসিয়াছেন। সদরের ও মহকুমার উকিল-মোক্তারও অনেকে উপস্থিত আছেন। ভালকুটি গ্রামের মুচিদের ব্যাণ্ড-বাজনা পর্যন্ত ভাড়া করা হইয়াছে। আবাহন, বরণ, পুষ্পবর্ষণ, মাল্যদান, স্তবগান শেষ হইতে হইতেই করতালি-ধ্বনিতে আসর বেশ জমিয়া উঠিল। সভামণ্ডপের একটা দিক অধিকার করিয়া সারি সারি চেয়ারে চোগা চাপকান পাগড়ি আংটি চেন ঘড়িতে সুশোভিত হইয়া মুখুজ্জে-কর্তারা বসিয়া আছেন। কয়জন তরুণবয়স্কের পরিধানে হ্যাট কোট টাই, চোখে চশমা। কর্তারা প্রত্যেক অনুষ্ঠানের শেষে ঘাড় নাড়িয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন।

অতঃপর আসিল বক্তৃতা-পর্ব। এইবার আসরটা যেন ঝিমাইয়া পড়িল। দেখা গেল, সকলেই হাততালি দিবার লোক—বক্তৃতা দিবার লোক কেহ নাই। অবশেষে জেলার ফৌজদারী আদালতের একজন উকিল উঠিয়া এই কমলাশ্রিত বংশটিকে কল্প-তরুর সহিত তুলনা করিয়া বেশ খানিকটা বলিয়া আসরের মানরক্ষা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে করতালিধ্বনিতে আসর যেন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

তারপর সভা আবার নিস্তব্ধ। সভাপতি জেলার জজসাহেব চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, বলুন, কেউ যদি কিছু বলবেন!

কেহ সাড়া দিল না।।

আবার সভাপতি বলিলেন, বলুন, বলুন, যদি কেউ বলতে চান!

রামপুর মহকুমার বৃদ্ধ মুন্সেফবাবু এবার হুটুবাবুকে অনুরোধ করিলেন, হুটুবাবু, আপনি কিছু বলুন !

হুটুবাবু—হুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপুর মহকুমার মোক্তার। সমবয়সী না হইলেও হুটুবাবুর সহিত মুন্সেফবাবুর ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা। হুটুবাবু হাতজোড় করিয়া বলিলেন, মাফ করবেন আমাকে।

সভাপতি কিন্তু মাফ করিলেন না, তিনি অনুরোধ করিয়া বলিলেন, না না, বলুন না কিছু আপনি !

হুটুবাবু এবার মোটা দুসূতী চাদরখানা খুলিয়া চেয়ারের হাতলের উপর রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর আরম্ভ করিলেন, সভাপতি মহাশয়, এবং মহাশয়গণ, আপনারা সকলেই বোধ হয় জানেন যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার মুখে প্রথমে দেয় মধু। লোকে বলে, আমার মা নাকি আমার মুখে নিমফুলের মধু দিয়েছিলেন। আমার কথাগুলো বড় তেতো। সেইজন্যেই আমি কোনো কিছু বলতে নারাজ ছিলাম। তবে ভরসা আছে, ব্যঞ্জনের মধ্যে উচ্ছের‌ও একটা স্থান আছে এবং দেহে রসাধিক্য হলে তিক্তভক্ষণই বিধেয়, সেইজন্যেই বসন্তে নিম্বভক্ষণের ব্যবস্থা। কঙ্কণা গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হল আমাদের ধনী মুখুজ্জে বাবুদের দানে, খুব সুখের কথা, আনন্দের কথা—ভালো অবশ্য বলতেই হবে। কিন্তু আমার বার বার মনে হচ্ছে, এ হল গোরু মেরে জুতো দান, আর জুতো-জোড়াটা ঐ মরা গোরুর চামড়াতেই তৈরি। এ অঞ্চলের সেচের পুকুরের সেচ বন্ধ করেছেন এই বাবুরা, ফলে অজন্মাহেতু অনাহারে চাষী আজ দুর্বল রোগের সহজ শিকার হয়েছে। সুদের সুদ তস্য সুদ তাদের কাছ থেকে আদায় করে তাদের পথে বসিয়ে—

সমস্ত সভাটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সভায় উপস্থিত মুখুজ্জে-বাবুরা বসিয়া বসিয়া ঘামিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের হাসি তখন কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহারা পাষাণ-মূর্তির মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের দিকে চাহিয়া সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলীও কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন।

হুটুবাবু তখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি বলিতেছিলেন, আমার পূর্বের বক্তা মহাশয় এঁদের কল্পতরুর সঙ্গে তুলনা করলেন। আমার মনে হয়, তিনি এঁদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসিকতা করেছেন, কারণ বাস্তব সংসারে কল্পতরু অলীক বস্তু—আকাশ-কুসুমের পুষ্পাঞ্জলির মতোই হাস্যকর। আমার মনে হয়, এঁদের তুলনা হয় একমাত্র খেজুরগাছের সঙ্গে। মেসোপটেমিয়ার খেজুরগাছ নয়, আমাদের খাঁটি দেশী আঁটিসার খেজুরগাছের সঙ্গে। তলায় বসে ছায়া কেউ কখনও পায় না, ফল—তাও আঁটিসার, আর আলিঙ্গন করলে তো কথাই নেই, একেবারে শরশয্যা। এঁদের সুদের হার

চক্রবৃদ্ধিহারে, এঁদের প্রজার জন্যে বরাদ্দ দোকানে বরাত—আধ পয়সার মুড়ি, আধ পয়সার বাতাসা, আর কেউ যদি কাকুতি-মিনতি করে সুদ মাফের জন্যে জড়িয়ে ধরে, তবে কথার কাঁটায় তার শরশয্যাই হয়। তবে ভরসার মধ্যে আমাদের হেঁসো—খেজুর গাছের গলা কাটবার জন্যে খাঁটি ইস্পাতে তৈরি অস্ত্র—এই এঁরা।

মুটুবাবু এবার সরকারী কর্মচারীবৃন্দের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, এটা বলা হইতেছে তাঁহাদিগকে।

খেজুরগাছের কাছে রস আদায় করতে হলে হেঁসো না হলে হয় না। হেঁসো চালালে গলগল করে মিষ্ট রসে খেজুরগাছ কলসী পূর্ণ করে দেয়। আজ তেমনই এক কলসী রস আমাদের বিলাতী পান-দেওয়া কাঞ্চননগরী হেঁসো এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের কল্যাণে এ চাকলার লোকে পেয়েছে, তাতে তাদের বুকফাটা তৃষ্ণার খানিকটা নিবারণ হবে। এজন্যে হেঁসো এবং খেজুরগাছ দু তরফকেই ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মুটুবাবু বসিলেন। কিন্তু করতালিধ্বনি বিশেষ উঠিল না, মাত্র কয়টা অবোধ ছেলে সোৎসাহে হাততালি দিয়া উঠিল। এতক্ষণে সভাস্থ সকলে হাতের উপর বারকয়েক হাত নাড়িলেন, কিন্তু শব্দ তাহাতে উঠিল না। তারপর সভা-প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ, সকলেই কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছিলেন। সমস্ত সভাটা বায়ুপ্রবাহহীন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষারাত্রির মতো ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে। মুখুজ্জে-বাবুরা মাথা হেঁট করিয়া রুদ্ধ রোষে অজগরের মতো ফুলিতেছিলেন।

কোনোমতে সভা শেষ হইয়া গেল, অভ্যাগতরা সকলে বিদায় হইয়া গেলেন, তারপর মুখুজ্জেরাও মাথা তুলিলেন। মাথা তুলিলেন বিষধর অজগরের মতোই, মুটু মোক্তারকে ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তো তাঁহারা আপন আপন অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

সংবাদটা কিন্তু মুটুবাবুর নিকট অজ্ঞাত রহিল না, যথাসময়ে রামপুরে বসিয়াই তিনি কঙ্কণার সংবাদ পাইলেন। বৃদ্ধ মুন্সেফবাবুই তাঁহাকে সংবাদটা দিলেন, কথাটা তাঁহারই কানে আসিয়া পৌছিয়াছিল। সংবাদ শুনিয়া মুটুবাবু হাসিয়া হাতজোড় করিয়া কাহাকে প্রণাম জানাইলেন।

মুন্সেফবাবু বলিলেন, বাবুদের প্রণাম জানাচ্ছেন নাকি ?

না, মহর্ষি দুর্বাসাকে প্রণাম জানালাম।

তা হলে বলুন নিজেকেই নিজে প্রণাম করলেন, লোকে তো আপনাকেই বলে—কলিযুগের দুর্বাসা।

ফুটুবাবু বলিলেন, না, তা হলে কোনো দিন লক্ষ্মীর দম্ভ চূর্ণ করবার জন্য সাগরতলে তাঁকে আবার একবার নির্বাসনে পাঠাতাম।

ফুটু মোক্তার ওই এক ধারার মানুষ। তিনি যে সেদিন বলিয়াছিলেন, আমার মা আমার মুখে নিমের মধু দিয়েছিলেন, সে কথাটা তাঁহার অতিরঞ্জন নয়, কথাটা না হউক তাঁহার ইঙ্গিতটা নির্জলা সত্য। বাল্যকাল হইতেই ওই তাঁহার স্বভাব।

প্রথম জীবনে বি. এ. পাস করিয়া ফুটুবাবু স্কুল-মাস্টারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে মনে কামনা ছিল, শিক্ষকতার একটি আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া যাইবেন। কিন্তু ওই স্বভাবের জন্যই তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হয় নাই, শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া মোক্তারি ব্যবসায় অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন।

ঘটনাটা ঘটিয়াছিল এইরূপ।—সেবার পূজার সময় তাঁহার গ্রামের ধনী এবং জমিদার চাটুজ্জেদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া তাহার স্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আর আমি কোথাও নেমন্তন্ন খেতে যাব না।

ফুটুবাবু কি একখানা বই পড়িতেছিলেন, তিনি মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন?

এ 'কেন'র উত্তর তাহার স্ত্রী সহজে দিতে পারিল না, বলিতে গিয়া বার বার সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিরক্ত হইয়া ফুটুবাবু বই বন্ধ করিয়া ভালো করিয়া উঠিয়া বসিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া বহুকষ্টে অবশেষে জানিলেন, তাঁহার স্ত্রী দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের সালঙ্কারা বধূদের পঙ্‌ক্তিতে খাইতে বসিয়াছিল, ফলে পরিবেশনের প্রতিটি দফাতেই সে অপমানিত হইয়াছে। যে ভাবে গৃহকর্ত্রী ও দাসীর প্রতি প্রত্যক্ষেই দুই ধারার ব্যবহার হইয়া থাকে, সেইভাবেই সে দাসীর মতো ব্যবহারই পাইয়াছে।

ফুটুবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, আরপর আপন মনেই বলিলেন, দুর্বাসা মিথ্যে তোমায় অভিসম্পাত দেয় নি! সে ঠিক করেছিল।

তাঁহার স্ত্রী কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। ফুটুবাবুর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিবদ্ধ হইতেই সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

ফুটুবাবু বলিলেন, আচ্ছা, দুটো বছর সময় আমাকে দাও। এর প্রতিকার আমি করব।

তাহার পরই তিনি মোক্তারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিলেন। এক বৎসরেই মোক্তারি পাস করিয়া তিনি রামপুর মহকুমায় প্র্যাকটিস আরম্ভ করিয়া দিলেন। তৃতীয় বৎসরের পূজায় সধবা-ভোজনের সময় একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। মাছ

পরিবেশন চলিতেছিল, পরিবেশক মুটুবাবু স্ত্রীর পাতার নিকট আসিতেই সে প্রকাণ্ড একটা টাকার তোড়া কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া সশব্দে নামাইয়া দিয়া বলিল, এই এঁদের সমান গহনাই আমার হবে, এই তার টাকা। এখন ওঁদের সমান মাছ আমাকে না দাও, একখানার চেয়ে কম আমাকে দিও না।

পরিবেশকের হাত হইতে মাছের বালতিটা খসিয়া পড়িয়া গেল। তারপর গ্রাম জুড়িয়া দেশ জুড়িয়া সে এক তুমুল আন্দোলন। লোকে মুটুবাবুকেই দোষ দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহার ঊর্ধ্বতন পুরুষগণকেও দোষ দিয়া বলিয়াছিল, বিছুটির ঝাড়, গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে হুল। জ্বালা-ধরানো ওদের স্বভাব।

মুটুবাবাবুর পিতামহ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত লোক, কিন্তু পাণ্ডিত্যের খ্যাতির তুলনায় অপ্রিয় সত্যভাষণের অখ্যাতি ছিল বেশি। সে আমলের কোনো-এক রাজ-বাড়িতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শাস্ত্র-বিচারের আসরে যুবরাজ তাঁহার নাসিকাগ্র প্রবেশ করাইয়া ফোড়ন দিতে দিতে গীতার একটা শ্লোক আওড়াইয়া উঠিয়াছিলেন, মশায়, স্বয়ং ভগবান বলে গেছেন, যদা যদাহি ধর্মস্য—

মুটুবাবুর পিতামহ বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, জিহ্বার জড়তা দূর হয় নি আপনার, আরও মার্জনা দরকার, জদা জদা নয়, যদা যদা।

মুটুবাবুর পিতার নাম ছিল—কুনো কালীপ্রসাদ। তিনি বিদ্যায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন না বা অন্য কোনো বিশেষত্বও তাঁহার ছিল না। সমাজে তাঁহার কোনো প্রতিষ্ঠাও হয় নাই, সেজন্য দাবিও কোনোদিন তিনি করেন নাই। কিন্তু সমস্ত জীবনটা তিনি ঘরের কোণে বসিয়াই কাটাইয়া গিয়াছেন। শত্রুতা তিনি কাহারও সহিত কোনোদিন করেন নাই, কিন্তু তবু লোকে বলিত, কি অহঙ্কার লোকটার!

যাক, ওসব পুরাতন কথা।

মুটুবাবু কঙ্কণার জমিদারদের শপথের কথা শুনিয়া বিচলিত হইলেন না। এদিকে কঙ্কণার বাবুরা তাঁহাদের চিরাচরিত প্রথায় প্রতিশোধ-গ্রহণের পন্থা অবলম্বন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চর বিফলমনোরথ হইয়া হইয়া ফিরিয়া সংবাদ দিল, মুটুবাবুর ঋণ কোথাও নাই। বাবুরা সংবাদ লইতেছিলেন, কোথায় কাহার কাছে মুটু-মোক্তারের হ্যাণ্ডনোট বা তমসুক আছে। থাকিলে সেগুলি কিনিয়া ঋণজালে আবদ্ধ মুটুকে আয়ত্ত করিয়া তাঁহাকে বধ করিতেন।

মুখুজ্জেদের বড়কর্তা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহার কর্মচারীকে প্রশ্ন করিলেন, লাট কমলপুরের জমিদারদের এখন অবস্থা কেমন?

কমলপুরেই মুটুবাবুর বাড়ি, তাঁহার জমিজমা; পুকুর, বাগান যাহা কিছু সম্পত্তি সমস্তই কমলপুরের এলাকার মধ্যে।

সরকার উত্তর দিল, অবস্থা অবিশ্যি তেমন ভালো নয়, তবে ওই চলে যায় কোনো রকমে সব। দু এক ঘরের অবস্থা একেবারেই ভালো নয়।

কর্তা বলিলেন, তবে কিনে ফেল তাদের অংশ। টাকা বেশি লাগে লাগুক। হ্যাঁ, তবে আমাদের সকল শরিককে একবার জিজ্ঞাসা কর।

মাস চারেক পর।

সন্ধ্যার সময় নুটুবাবু সন্ধ্যা-উপাসনা করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নুটুবাবু কিন্তু দেখিয়াও দেখিলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া স্ত্রী বলিল, ওগো, কমলপুর থেকে আমাদের মহাভারত মোড়ল এসেছে।

নুটুবাবু চোখ বুজিয়া ধ্যানে বসিলেন।

স্ত্রী বলিল, তাকে নাকি কঙ্কণার বাবুরা মারধর করেছে, তার পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে নিয়েছে, গোরুগুলো খোঁয়াড়ে দিয়েছে!

নুটুবাবু মুদ্রিত নেত্রেই নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার স্ত্রী এবার বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল। নিয়মমতো সন্ধ্যা-উপাসনা শেষ করিয়া নুটুবাবু উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, কই দুধ গরম হয়েছে?

স্ত্রী আসিয়া দুধের বাটি নামাইয়া দিল, নুটুবাবু বলিলেন, দেখ, ভগবানকে যখন মানুষ ডাকে, তখন তাকে চঞ্চল করতে নেই।

স্ত্রী বলিল, বেচারার যে হাপুস নয়নে কান্না, আমি আর থাকতে পারলাম না বাপু। মুখের খাবার বেচারার চোখের জলে নোন্তা হয়ে গেল।

মুখ ধুইয়া পান মুখে দিয়া নুটুবাবু বাহিরের ঘরে আসিতেই মহাভারত তাঁহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল। নুটুবাবু তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, ওঠ ওঠ কী করেছে আগে বল, তারপর কাঁদবে।

মহাভারতের কান্না আরও বাড়িয়া গেল।

নুটুবাবু এবার অত্যন্ত কঠিন স্বরে বলিলেন, বলি, উঠবে না কি?

কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায় ও কথার ভঙ্গিমায় মহাভারত এবার সসঙ্কোচে উঠিয়া বসিয়া করুণভাবে চোখের জল মুছিতে আরম্ভ করিল।

নুটুবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, কী হয়েছে বল!

আজ্ঞে, কঙ্কণার বাবুরা আমার পুকুরের সমস্ত মাছ—এই হালি পোনা তিন ছটাক এক পো করে—

তিন ছটাক এক পো এখন বাদ দাও। তোমার পুকুরের সমস্ত মাছ কী হল, তাই বল!

আজ্ঞে, জোর করে বাবুরা ধরিয়ে নিলেন।

তারপর ?

এ প্রশ্নে মহাভারত অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হুটুবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, আর কি করেছেন ?

আজ্ঞে, আমার গোরু-বাছুর সব জোর করে ধরে খোঁয়াড়ে দিয়েছেন।

আর ?

এবার মহাভারত আবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, চাপরাসী দিয়ে ধরে বেঁধে আমাকে--

আর সে বলিতে পারিল না।

হুটুবাবু বলিলেন, হুঁ। কিন্তু কারণ কি ? কিসের জন্যে তোমার ওপর বাবুরা এমন করলেন ?

কোনোরূপে আত্মসংবরণ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে মহাভারত বলিল, আজ্ঞে, আমাকে ডেকে বাবুরা বললেন, হুটু মোক্তারের জমিজমা সব তুমিই ভাগে কর শুনেছি। তা তোমাকে ওসব জমি ছেড়ে দিতে হবে। হুটু মোক্তারের জমি এ চাকলায় কেউ চষতে পাবে না।

হুটুবাবু বলিলেন, হুঁ, তারপর ?

আজ্ঞে, আমি তাইতে জোড়হাত করে বললাম, হুজুর, তা আমি পারব না। তিনি বেরামভন—ভালো লোক—আমরা তিন পুরুষ ওনাদের জমি করছি—পুরনো মুনিব। তাতেই আজ্ঞে—

কান্নার আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, সে নীরবে রুদ্ধবাক হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

হুটুবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হু, তোমাকে মামলা করতে হবে মহাভারত। খরচপত্র সমস্ত আমার, আসা-যাওয়া আদালত-খরচা সব আমি দেব, তুমি মামলা কর। দেখ, ভেবে দেখ। কাল সকালে আমাকে জবাব দিও। আর সে যদি না পার, তুমি আমার জমি ছেড়ে দাও। তাতে আমি একটুও দুঃখ করব না। ক্ষতি যা হয়েছে, তা আমি তোমার পূরণ করে দেব।

তারপর তিনি লণ্ঠনের আলোটা বাড়াইয়া দিয়া খানকয়েক বই টানিয়া লইয়া বসিলেন। গভীর মনোযোগের সহিত আইনগুলি দেখিয়া বই বন্ধ করিয়া যখন উঠিলেন, তখন মহকুমা শহরটিও প্রায় নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে, অদূরবর্তী জংশন

স্টেশন-ইয়ার্ডে মালগাড়ির শান্টিঙের শব্দ গম্ভীর এবং উচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারত তখনও পর্যন্ত নির্বাক হইয়া নুটুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই নুটুবাবু বলিলেন, তুমি তখন থেকে বসে আছ মহাভারত ? জল তো খেয়েছ, কই তামাক-টামাক তো খাও নি ?

মহাভারতের চোখ তখনও ছলছল করিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, আজ্ঞে, এই যাই।

নুটুবাবু বলিলেন, তোমার ক্ষতি যা হয়েছে, সে আমি পূরণ করে দেব, কিন্তু অপমানের ক্ষতিপূরণ তো করতে পারব না। সেজন্যে তোমাকে মামলা করতে হবে, রাজার দোরে দাঁড়াতে হবে।

মহাভারত এবার আবার কাঁদিয়া ফেলিল, নুটুবাবুর কণ্ঠস্বরের স্নেহস্পর্শে তাহার শোক যেন উথলিয়া উঠিল, বলিল, আজ্ঞে বাবু, ছোট কচি মাছ, এই বছরের হালি-পোনা, একপো-তিন ছটাকের বেশি নয়।

নুটুবাবু এবার বিরক্ত হইলেন না, ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, হাসিলেন না, বলিলেন, যাও, তামাক-টামাক খেয়ে ভাত খেয়ে নাও গিয়ে।

মহাভারত চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

ভিতরে গিয়া নুটুবাবু স্ত্রীকে বলিলেন, আজ থেকে আর আমার বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হবে না।

সবিস্ময়ে স্ত্রী বলিয়া উঠিল, সেকি ! ও কি সব্বনেশে কথা !

নুটুবাবু বলিলেন, না, হবে না।

স্ত্রী প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

মোকদ্দমা দায়ের হইয়া গেল।

নুটুবাবুর পরিচালনাগুণে, তাঁহার তীক্ষ্ণধার প্রশ্নে প্রশ্নে সমগ্র ঘটনাটার উপরের সাজানো আবরণ খান-খান হইয়া খসিয়া পড়িয়া সত্যের নগ্নমূর্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহার উপর তাঁহার সূক্ষ্ম এবং দৃঢ় যুক্তিতর্কের প্রভাবে কঙ্কণার বাবুদের গোমস্তা ও চাপরাসীকে বিচারক দোষী স্থির না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদের প্রতি কঠিন দণ্ডবিধান করিলেন। দেশময় একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না, কঙ্কণার বাবুরা জজ-আদালতে আপীল করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ মুন্সেফবাবু আসিয়া বলিলেন, নুটুবাবু, যথেষ্ট হয়েছে, এইবার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন।

সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নুটুবাবু বলিলেন, বলছেন কী আপনি ?

ভালোই বলছি। বিরোধের তো এইখানেই শেষ নয়, ধরুন জজ-আদালতেও যদি এই সাক্ষাই বাহাল থাকে, তবে ওঁরা হাইকোর্ট যাবেন। তারপর ধরুন নতুন বিরোধও বাধতে পারে। ওঁদের তো পয়সার অভাব নেই। লোকে বলে কঙ্কণায় লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।

হুটুবাবু বলিলেন বিরোধ তো আমার ওই লক্ষ্মীর সঙ্গে। ওই দেবতাটির অভ্যাস হল লোকের মাথার ওপর পা দিয়ে চলা। তাঁর পা দুটি আমি মাটির ধুলোয় নামিয়ে দেব।

মুন্সেফবাবু বলিলেন, ছি-ছি কি যে বলেন আপনি হুটুবাবু!

হুটুবাবু উত্তর দিলেন, ঠিকই বলি আমি মুন্সেফবাবু, কিন্তু আপনার ভালো লাগছে না।

তারপর হাসিয়া আবার বলিলেন, না লাগবারই কথা। লক্ষ্মীর পা যে আপনার মাথায় চেপেছে ; পায়ের পথ তো সঙ্কীর্ণ, রথ চলবার মতো রাজপথ তৈরি হয়ে গিয়েছে। টাকটি আপনার বেশ প্রশস্ত !

মুন্সেফবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কথাটা বলেছেন বড় ভালো ! উঃ, বড্ড বলেছেন মশাই !

তারপর কিন্তু আর ও প্রসঙ্গে তিনি কোন কথা বলিলেন না। হাস্য-পরিহাসের মধ্যে সন্ধ্যাটা কাটিয়া গেল ?

কিন্তু লক্ষ্মীর পরাজয় এত সহজে হয় না, জজ-আদালতের আপীলে মামলাটা ডিসমিস হইয়া গেল। হুটুবাবু মুখ রাঙা করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যের অপমানে পরাজয়ে ক্ষোভ লজ্জার তাঁহার আর সীমা ছিল না। কিন্তু বিস্মিত তিনি হন নাই। জজ-আদালতের উকিলের সওয়াল শুনিয়াই তিনি এ পরিণতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সদর হইতে রামপুরে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যায় নিয়মিত সন্ধ্যা উপাসনায় বসিয়াছেন, এমন সময় বাড়ির বাহিরে বোধ করি খানদশেক ঢাক একসঙ্গে তুমুল শব্দে বাজিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাঁহার স্ত্রী বিস্ময়বিহ্বলের মতো আসিয়া বলিল, ওগো, কঙ্কণার বাবুরা দোরের সামনে ঢাক বাজাতে হুকুম দিয়েছে। ধেই-ধেই ক'রে নাচছে গো সব। হুটুবাবু কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না, যেমন ধ্যানে বসিয়াছিলেন তেমনই ভাবে বসিয়া রহিলেন।

মাসখানেক পর কঙ্কণায় বাবুদের বাড়িতে আবার একটা সমারোহ হইয়া গেল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করিলে পাণ্ডবেরা সমারোহ করেন নাই কিন্তু হুটু মোক্তার পরাজয়ের লজ্জায় মোক্তারি ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায়

পলাইয়া গেলে কঙ্কণার বাবুরা বেশ একটি সমারোহ করিলেন। সেই সমারোহের মধ্যে তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, বেটাকে ঢাক বাজিয়ে মোক্তারি ছাড়ালাম, এইবার টিন বাজিয়ে গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।

বড়কর্তা বলিলেন, তার আগে ওই বেটা মহাভারতকে শেষ কর, আঠারো পর্বের এক পর্বও যেন বেটার না থাকে।

বৎসর তিনেকের মধ্যেই কঙ্কণার বাবুদের সে প্রতিজ্ঞাও প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল। মহাভারত সর্বস্বান্ত হইয়া মনে মনে নিষ্কৃতির একটা সহজ উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য গোঁয়ার মহাভারত, কিছুতেই বাবুদের পায়ে গড়াইয়া পড়িল না। হুটু মোক্তার সেই দেশ ছাড়িয়াছেন, আজও ফেরেন নাই। স্ত্রী আছে তাহার পিত্রালয়ে।

সেদিন জমিদারের হিতৈষী গ্রাম্য মণ্ডল আসিয়া মহাভারতকে বলিল, ওরে বাবুদের পায়ে গিয়ে গড়িয়ে পড়। জলে বাস করে কি কুমিরের সঙ্গে বাদ করা চলে?

ছন্নমতি মহাভারত উত্তর দিল, কুমিরে বাদ করলেও খায়, না করলেও খায়। তার চেয়ে বাদ করে মরাই ভালো।

মণ্ডল বিরক্ত হইয়া বলিল, আলক্ষ্মী ঘাড়ে ভর করলে মানুষের এমনই মতিই হয় কিনা!

মহাভারত বলিল, আলক্ষ্মীই আমার ভালো দাদা, উনি কাউকে ছেড়ে যান না।

মণ্ডল অবাক হইয়া গেল, অবশেষে বলিল, তোর দোষ কী বল? নইলে ব্রাহ্মণ জমিদার—

মহাভারত অকস্মাৎ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া হাত-পা নাড়িয়া ভঙ্গি করিয়া বলিল, চণ্ডাল কসাই।

দিন দুই পরই মহাভারতের ঘরের জীর্ণ চালে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নারী ও বালকের আর্ত চীৎকারে লোকজন আসিয়া দেখিল, মহাভারতের ঘর জ্বলিতেছে, কিন্তু মহাভারতের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে একজন দীর্ঘকায় কালো জোয়ানের বুকে নির্মম-ভাবে চাপিয়া বসিয়া আছে। বহুকষ্টে লোকটাকেই সর্বাগ্রে মহাভারতের কবলমুক্ত করা হইল। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, জল!

মহাভারত লাফ দিয়া গিয়া জ্বলন্ত চালের একগোছা খড় টানিয়া আনিয়া বলিল, খা!

ওই লোকটাই মহাভারতের ঘরে আগুন দিয়াছে, লোকটা কঙ্কণার বাবুদের চাপরাসী। মহাভারত তাহাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিল। পরদিন সে অত্যন্ত

ভালোই বলছি। বিরোধের তো এইখানেই শেষ নয়, ধরুন জজ-আদালতেও যদি এই সাজাই বাহাল থাকে, তবে ওঁরা হাইকোর্ট যাবেন। তারপর ধরুন নতুন বিরোধও বাধতে পারে। ওঁদের তো পয়সার অভাব নেই। লোকে বলে কঙ্কণায় লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।

মুটুবাবু বলিলেন বিরোধ তো আমার ওই লক্ষ্মীর সঙ্গে। ওই দেবতাটির অভ্যাস হল লোকের মাথার ওপর পা দিয়ে চলা। তাঁর পা দুটি আমি মাটির ধুলোয় নামিয়ে দেব।

মুন্সেফবাবু বলিলেন, ছি-ছি কি যে বলেন আপনি মুটুবাবু!

মুটুবাবু উত্তর দিলেন, ঠিকই বলি আমি মুন্সেফবাবু, কিন্তু আপনার ভালো লাগছে না।

তারপর হাসিয়া আবার বলিলেন, না লাগবারই কথা। লক্ষ্মীর পা যে আপনার মাথায় চেপেছে; পায়ের পথ তো সঙ্কীর্ণ, রথ চলবার মতো রাজপথ তৈরি হয়ে গিয়েছে। টাকটি আপনার বেশ প্রশস্ত!

মুন্সেফবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কথাটা বলেছেন বড় ভালো! উঃ, বড্ড বলেছেন মশাই!

তারপর কিন্তু আর ও প্রসঙ্গে তিনি কোন কথা বলিলেন না। হাস্য-পরিহাসের মধ্যে সন্ধ্যাটা কাটিয়া গেল?

কিন্তু লক্ষ্মীর পরাজয় এত সহজে হয় না, জজ-আদালতের আপীলে মামলাটা ডিসমিস হইয়া গেল। মুটুবাবু মুখ রাঙা করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যের অপমানে পরাজয়ে ক্ষোভ লজ্জার তাঁহার আর সীমা ছিল না। কিন্তু বিস্মিত তিনি হন নাই। জজ-আদালতের উকিলের সওয়াল শুনিয়াই তিনি এ পরিণতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সদর হইতে রামপুরে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যায় নিয়মিত সন্ধ্যা উপাসনায় বসিয়াছেন, এমন সময় বাড়ির বাহিরে বোধ করি খানদশেক ঢাক একসঙ্গে তুমুল শব্দে বাজিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাঁহার স্ত্রী বিস্ময়বিহ্বলের মতো আসিয়া বলিল, ওগো, কঙ্কণার বাবুরা দোরের সামনে ঢাক বাজাতে হুকুম দিয়েছে। ধেই-ধেই ক'রে নাচছে গো সব। মুটুবাবু কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না, যেমন ধ্যানে বসিয়াছিলেন তেমনই ভাবে বসিয়া রহিলেন।

মাসখানেক পর কঙ্কণায় বাবুদের বাড়িতে আবার একটা সমারোহ হইয়া গেল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করিলে পাণ্ডবেরা সমারোহ করেন নাই কিন্তু মুটু মোক্তার পরাজয়ের লজ্জায় মোক্তারি ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায়

পলাইয়া গেলে কঙ্কণার বাবুরা বেশ একটি সমারোহ করিলেন। সেই সমারোহের মধ্যে তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, বেটাকে ঢাক বাজিয়ে মোক্তারি ছাড়ালাম, এইবার টিন বাজিয়ে গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।

বড়কর্তা বলিলেন, তার আগে ওই বেটা মহাভারতকে শেষ কর, আঠারো পর্বের এক পর্বও যেন বেটার না থাকে।

বৎসর তিনেকের মধ্যেই কঙ্কণার বাবুদের সে প্রতিজ্ঞাও প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল। মহাভারত সর্বস্বান্ত হইয়া মনে মনে নিষ্কৃতির একটা সহজ উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য গোঁয়ার মহাভারত, কিছুতেই বাবুদের পায়ে গড়াইয়া পড়িল না। ঘুটু মোক্তার সেই দেশ ছাড়িয়াছেন, আজও ফেরেন নাই। স্ত্রী আছে তাহার পিত্রালয়ে।

সেদিন জমিদারের হিতৈষী গ্রাম্য মণ্ডল আসিয়া মহাভারতকে বলিল, ওরে বাবুদের পায়ে গিয়ে গড়িয়ে পড়। জলে বাস করে কি কুমিরের সঙ্গে বাদ করা চলে?

ছন্নমতি মহাভারত উত্তর দিল, কুমিরে বাদ করলেও খায়, না করলেও খায়। তার চেয়ে বাদ করে মরাই ভালো।

মণ্ডল বিরক্ত হইয়া বলিল, আলক্ষ্মী ঘাড়ে ভর করলে মানুষের এমনই মতিই হয় কিনা!

মহাভারত বলিল, আলক্ষ্মীই আমার ভালো দাদা, উনি কাউকে ছেড়ে যান না।

মণ্ডল অবাক হইয়া গেল, অবশেষে বলিল, তোর দোষ কী বল? নইলে ব্রাহ্মণ জমিদার—

মহাভারত অকস্মাৎ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া হাত-পা নাড়িয়া ভঙ্গি করিয়া বলিল, চণ্ডাল কসাই।

দিন দুই পরই মহাভারতের ঘরের জীর্ণ চালে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নারী ও বালকের আর্ত চীৎকারে লোকজন আসিয়া দেখিল, মহাভারতের ঘর জ্বলিতেছে, কিন্তু মহাভারতের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে একজন দীর্ঘকায় কালো জোয়ানের বুকে নির্মম-ভাবে চাপিয়া বসিয়া আছে। বহুকষ্টে লোকটাকেই সর্বাগ্রে মহাভারতের কবলমুক্ত করা হইল। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, জল!

মহাভারত লাফ দিয়া গিয়া জ্বলন্ত চালের একগোছা খড় টানিয়া আনিয়া বলিল, খা!

ওই লোকটাই মহাভারতের ঘরে আগুন দিয়াছে, লোকটা কঙ্কণার বাবুদের চাপরাসী। মহাভারত তাহাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিল। পরদিন সে অত্যন্ত

হৃষ্টচিত্তে দগ্ধ গৃহের অঙ্গার লইয়া তামাক সাজিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে তামাক টানিতেছিল, এমন সময় কে তাহাকে ডাকিল, মহাভারত!

মহাভারত বাহিরে আসিয়া দেখিল, জমিদারের গোমস্তা দাঁড়াইয়া আছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, মিটমাট আমি করব না হে। কি করতে এসেছ তুমি?

গোমস্তা হাসিয়া বলিল, আরে শোন, শোন।

কোনো কিছু না শুনিয়াই তাহার মুখের কাছে দুই হাতের বুড়া আঙুল ঘন ঘন নাড়িয়া মহাভারত বলিল, খটখট লবডঙ্কা, খটখট লবডঙ্কা, আর আমার করবি কী।

গোমস্তা মুখ লাল করিয়া ফিরিয়া গেল, যাইবার সময় কিন্তু বলিয়া গেল, জানিস বেটা চাষা, পৃথিবীটা কার বশ?

দিন দুয়েক পরেই রামপুর হইতে মুটুবাবুর পুরাতন মুহুরীটি আসিয়া মহাভারতকে লইয়া চলিয়া গেল।

সেইদিনই দ্বিপ্রহরে রামপুরের ফৌজদারী আদালতে মহাভারতকে সঙ্গে লইয়া মুটুবাবু উকিলের গাউন পরিয়া আদালতে প্রথম প্রবেশ করিলেন। তিনি উকিল হইয়া ফিরিয়াছেন। তিনি এতদিন কলিকাতায় আইন পড়িতেছিলেন।

এবার কঙ্কণার বাবুরা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মুটুবাবুর তদ্বিরে তদারকে স্বয়ং এস-ডি-ও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত কঙ্কণার বাবুদের নায়েব গোমস্তাকে পর্যন্ত আসামী-শ্রেণীভুক্ত করিয়া মামলাটা দায়রা আদালতে বিচারার্থ পাঠাইয়া দিলেন। মুটুবাবু নিজেও সদরে গিয়া বসিলেন, শুধু বসিলেন নয়, সরকারী উকিলের সহযোগে নিজেই মামলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই নানা জনে বহু বিনীত অনুরোধ এবং বহু প্রকার লোভনীয় প্রস্তাব লইয়া মুটুবাবুকে আসিয়া ধরিয়া বলিল, মিটিয়ে ফেলুন, তাতে আপনারই মর্যাদা বাড়বে।

মুটুবাবু বলিলেন, বড়লোকের সঙ্গে গরিবের ঝগড়া কি আপোষে মেটে? কোনো কালে মেটে নি, মিটবেও না।

শেষ পর্যন্ত বলিলেন, বাবুরা যদি ঢাক কাঁধে করে আদালতের সামনে বাজাতে পারে, কি মহাভারতের ঘরের চালে উঠে নিজেরা চাল ছাওয়াতে পারে, তবে না হয় দেখি।

প্রস্তাবকারীরা মুখ কালো করিয়া উঠিয়া গেল, বিচার চলিতে লাগিল। সাক্ষী-সাবুদ শেষ হইয়া গেলে সরকারী উকিলের সম্মতিক্রমে মুটুবাবু প্রথমে সাওয়াল আরম্ভ করিলেন। সে যেন অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরির মুখ খুলিয়া গেল। গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ প্রদীপ্ত ভাষায় সমগ্র ঘটনা যেন চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল, প্রবলের অত্যাচারে

দুর্বলের হাহাকার যেন রূপ পরিগ্রহ করিল। বিবাদের মূলসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই অগ্নিদাহ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনা সাক্ষীদের উক্তির সহিত মিলাইয়া দেখাইয়া অবশেষে বলিলেন, আজ সমস্ত পৃথিবীময় ধনের মত্ততায় মত্ত ধনীর অত্যাচারে পৃথিবী জর্জরিত হয়ে উঠেছে। এই বিচারাধীন ঘটনাটি তার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে, ধনীর অনুগ্রহপুষ্ট দুর্বলের উপর দণ্ডবিধান করা ছাড়া আজ ধর্মাধিকরণের গত্যন্তর নাই। কিন্তু সে বিচার একজন করবেন—যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিরাজমান, সর্বনিয়ন্তা—তিনি এর বিচার অবশ্যই করবেন। সে বিচারের রায়ের সামান্য একটু অংশ আমরা জানি, ঈশ্বরের পুত্র মহামানব যীশুখ্রীষ্ট জানিয়ে দিয়ে গেছেন ; তিনি বলেছেন, "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the Kingdom of God." [ধনীর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অপেক্ষা সূচীমুখে উটের প্রবেশও সহজ।]

তাঁহার সওয়ালের পর সরকারী উকিল আর কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। বিচারে অপরাধীদের কঠিন দণ্ড হইয়া গেল। বিচারশেষে সুটুবাবু বাহিরে আসিতেই তাঁহার মুহুরী বলিল, তিনটে মামলার কাগজ নিয়ে মক্কেল বসে আছে।

সুটুবাবুর মাথায় তখনও ঐ মোকদ্দমার কথাই ঘুরিতেছিল, তিনি ললাট কুঞ্চিত করিয়া মুহুরীর দিকে চাহিলেন।

সে বলিল, একটা দায়রা, আর দুটো এস. ডি. ও.-র কোর্টের মামলা, ফী বলেছি চার টাকা করে।

পিছন হইতে একজন পুরাতন মোক্তার-বন্ধু আসিয়া অভিনন্দন জানাইয়া বলিল, চমৎকার আর্গুমেণ্ট হয়েছে! এবার কিন্তু ছেঁড়া জুতো জামা পালটাও ভাই। আমার হাতে একটা কেস আছে, তোমাকেই ওকালত-নামা দেব। মক্কেল কিন্তু গরিব।

সুটুবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, পাঠিয়ে দিও। পয়সার জন্যে কিছু এসে যাবে না। বিচিত্র পৃথিবী, কিন্তু সে বৈচিত্র্য অপেক্ষাও পৃথিবীর বুকের ঘটনাপ্রবাহের ধারা বিচিত্রতর এবং বিস্ময়কর। সেই বিচিত্র ধারার গতিতেই কঙ্কণার বাবুদের সহিত সুটুবাবুর বিরোধ অকস্মাৎ একটা অসম্ভব পরিণতিতে আসিয়া শেষ হইয়া গেল।

পনেরো বৎসর পর। সেদিন হঠাৎ কঙ্কণার বাবুদের জুড়িটা আসিয়া সুটুবাবুর বাড়িতে প্রবেশ করিয়া গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইল। গাড়ির ভিতর হইতে নামিলেন কঙ্কণার বৃদ্ধ বড়কর্তা, তাঁহার পুত্র এবং সেজ তরফের কর্তা। সুটুবাবুর দারোয়ান কায়দা-মাফিক সেলাম করিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন খানসামা আসিয়া সসম্ভ্রমে

অভিবাদন করিয়া ঝাড়ন দিয়া অসনগুলি ঝাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ কর্তা ঘরের চারিদিক চাহিয়া বলিলেন, তাই তো হে, মুটু যে আমাদের ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছে, অ্যাঁ! বাঃ বাঃ বাঃ, বলিহারি, বলিহারি!

কর্তার পুত্র একজন খানসামাকে বলিলেন, একবার উকিলবাবুকে খবর দাও দেখি, বল কঙ্কণার বড়কর্তা সেজকর্তা এসেছেন।

মুটুবাবু বিস্মিত হইলেন, এবং অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, আসুন, আসুন, আসুন! মহাভাগ্য আমার আজ!

বড়কর্তা বলিলেন, সে তো না বলতেই এসেছি হে, এখন বসতে দেবে কি না বল, না তাড়িয়ে দেবে?

মুটুবাবু একটু অস্তুপ্রত হইয়া বলিলেন, দেখুন দেখি, তাই কি আমি পারি, না কোনো মানুষে পারে?

বড়কর্তা মুচকি হাসিয়া বলিলেন, আজ তোমার সঙ্গে সওয়াল করব, দাঁড়াও। দেশের মধ্যে তো তুমি এখন সবচেয়ে বড় উকিল, এ জেলা ও জেলা থেকেও তোমাকে নিয়ে যায়। দেখি কে হারে!

মুটুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, বেশ, এখন বসুন।

বড়কর্তা বলিলেন, ধর, তোমার বাড়ি ভিখারী এসেছে, তাকে বসতে বলে আর কি আপ্যাইত করবে, যদি ভিক্ষেই তাকে না দাও!

মুটুবাবু জোড়হাত করিয়া বলিলেন, আমার কাছে আপনারা ভিক্ষে চাইবেন, এ যে অসম্ভব কথা, আশঙ্কার কথা! এ যে বলির দ্বারে বামনের ভিক্ষে চাওয়া! বেশ, আগে বসুন।

বড়কর্তা বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, উঁহু। আগে তুমি বল যে দেবে, তবে বসি, নইলে যাই।

মুটুবাবু বলিলেন, বেশ, বলুন, সাধ্যের মধ্যে যদি হয় তবে দেব আমি।

বড়কর্তা বলিলেন, তোমার ছেলেটিকে আমায় ভিক্ষে দিতে হবে, আমার নাতনীটিকে তোমায় আশ্রয় দিতে হবে।

তাঁহার পুত্র আসিয়া মুটুবাবুর হাত দুইটি চাপিয়া ধরিল, মুটুবাবুর বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সেজকর্তা বলিলেন, তোমার এ ছেলে খুব ভালো বি. এ.তে. এম. এ.-তে ফার্স্ট হয়েছে; তুমিও এখন মস্ত ধনী, বড় বড় জায়গা থেকে তোমার ছেলের সম্বন্ধ আসছে সবই ঠিক। কিন্তু কঙ্কণার মুখুজ্জেদের বাড়ির মেয়ে এনে কুলে মানে অযোগ্য হবে না। রূপের কথা বলব না, সে তুমি নিজে দেখবে।

ন্টুবাবু বড়কর্তার এবং সেজকর্তার পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন, আপনাদের নাতনী আমার বাড়ি আসবে সত্যিই সে আমার সৌভাগ্য।

সমারোহের মধ্যেই যে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল সমারোহের মধ্যেই তাহার অবসান হইয়া গেল।

বিবাহ শেষ হইয়া গেল।

অনুষ্ঠান শেষ হইলেও উৎসবের শেষ তখনও হয় নাই। সমাগত আত্মীয় স্বজনদের সকলে এখনও বিদায় হয় নাই। কয়েকটি হাভাতে অতিলোভী আত্মীয় বিদায় লইবে বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের ছেলেগুলার জ্বালায় ছবি ফুলদানি-গুলি ভাঙিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

ন্টুবাবু প্রাতঃকালে একখানা ইজি-চেয়ারে শুইয়া তামাক টানিতে টানিতে ঐ কথাই ভাবিতেছিলেন। নিয়মের ব্যতিক্রমে, অপরিমিত পরিশ্রমে শরীর তাঁহার অসুস্থ, বেশ একটু জ্বরও যেন হইয়াছে। চাকরটা আসিয়া সংবাদ দিল তাঁহার ফাউন্টেনপেনটা পাওয়া যাইতেছে না। ন্টুবাবুর রক্ত যেন মাথায় চড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহিণীকে ডাকিতে বলিলেন। গৃহিণী আসিতেই তিনি বলিলেন, রতনপুরের কালীর মাকে, পারুলের শ্যামা-ঠাকরুনকে আজই বাড়ি যেতে বলে দাও।

সবিস্ময়ে গৃহিণী বলিল, তাই কি হয়? নিজে থেকে না গেলে কি যেতে বলা যায়? আপনার লোক!

ন্টুবাবু বলিলেন, আপনার জনের হাত থেকে আমি নিস্তার পেতে চাই বাপু, দোহাই তোমার, বিদেয় কর ওদের। বরং কিছু দিয়ে-থুয়ে দাও, চলে যাক ওরা, নইলে ঘর দোর পর্যন্ত ভেঙে চুরমার করে দেবে।

গৃহিণী একটু বিরক্তভাবেই অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। ন্টুবাবু ক্লান্তভাবেই চেয়ারে শুইয়া, বোধ করি, পরিত্রাণেরই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মুহুরী আসিয়া রায়ের নথি সম্মুখের টেবিলটার উপর নামাইয়া দিয়া বলিল, রায়ের নকলটা কাল চেয়েছিলেন। কিন্তু বাজে খরচ কিছু বেশি হয়ে গেল।

ন্টুবাবু সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। একটা দায়রা মোকদ্দমার রায়ের নকল। মোকদ্দমাটায় ন্টুবাবুর অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজয় ঘটিয়াছে। তাঁহার কয়েকটি সূক্ষ্ম যুক্তি বিচারক অন্যায়ভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি রায়খানা তুলিয়া লইলেন। মুহুরীটি চলিয়া গেল। রায়খানা পড়িতে পড়িতে ন্টুবাবুর মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল। বিচারকের মন্তব্য এবং বিচারপদ্ধতির বক্রগতি দেখিয়া তাঁহার ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। দারুণ উত্তেজনাবশে রায়খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া

ঘরের মধ্যে পায়চারি আরম্ভ করিলেন। উপরের ঘরটাতেই দুমদাম হুটপাট শব্দে ঐ আত্মীয়দের ছেলেগুলি যেন মগের উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ঘুটুবাবু অত্যন্ত বিরক্তিভরে উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ভগবান, রক্ষে কর! চাকরটা ঘরের মধ্যে আসিয়া কতকগুল চিঠি টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। চিঠিগুলা দেখিতে দেখিতে একখানা অতি-পরিচিত হাতের লেখা খাম দেখিয়া সাগ্রহে খুলিয়া ফেলিলেন। হাঁ, পুরাতন বন্ধু সেই বৃদ্ধ মুন্সেফবাবুর চিঠি। এই বিবাহে আসিতে অক্ষমতার জন্য ক্ষমা চাহিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

যাবার বাতিক অসম্ভবরূপে প্রবল হলেও বাতের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারলাম না, পরাজয় মানতে হল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই আপনার ছেলে ও বউমাকে আশীর্বাদ করছি। ডাকযোগে আশীর্বাদীও কিছু পাঠালাম, গ্রহণ করবেন।

পরিশেষে লিখিয়াছেন—

আজ একটা কথা বলব, রাগ করবেন না। একদিন আপনি বলেছিলেন, মা-লক্ষ্মীর অভ্যেস হল লোকের মাথার ওপর দিয়ে পথ করে চলা। তাঁর চরণ দুখানি আপনি পথের ধুলোয় নামাব বলেছিলেন। কিন্তু টেনে টেনে নিজের মাথাতেই চাপালেন যে! লজ্জা পাবেন না, চরণ দুখানি এমনই লোভনীয়ই বটে, মাথায় না ধরে পারা যায় না! মাথায় কি দেবীর রজত-রথের উপযোগী রাজপথ তৈরি হয়েছে, বলি—টাক পড়েছে, টাক?

চিঠিখানার কথাগুলি যেন তীরের মতো তাঁহার মস্তিষ্কে গিয়া বিঁধিল। উত্তেজিত অসুস্থ মনের মধ্যে অকস্মাৎ একটি অদ্ভুত মুহূর্ত আসিয়া গেল। সমগ্র জীবনটা এই মুহূর্তের মধ্যে ছায়াছবির মতো তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল। এই ঘর এই ঐশ্বর্য সমস্ত যেন কুৎসিত ব্যঙ্গে হিহি করিয়া হাসিতেছে। আবার মনে হইল, ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো ছবিগুলির মধ্যে সমস্তগুলিতেই মুন্সেফবাবুর ব্যঙ্গহাস্য-বক্র মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে। রতনপুরের কালীর মা, পারুলের শ্যামা-ঠাকরুন উপরতলায় বিজয়োল্লাসে কি তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে!

তিনি থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একখানা আসনে বসিয়া পড়িলেন। মহাভারত আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, আজ্ঞে, পারুলের শ্যামা-ঠাকরুন বাড়ি যাচ্ছেন, আমিও যাই ওই সঙ্গে।

ঘুটুবাবু কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না, তাঁহার শ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার দরজাটা খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু কই, দরজা কই?

অগ্রদানা

একটা ছয় ফুট সাড়ে ছয় ফুট লম্বা কাঠিকে মাঝামাঝি মচকাইয়া নোয়াইয়া দিলে যেমন হয়, দীর্ঘ শীর্ণ পূর্ণ চক্রবর্তীর অবস্থাও এখন তেমনই। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে সে এমন ছিল না, তখন সে বত্রিশ বৎসরের জোয়ান, খাড়া সোজা। লোকে বলিত, মই আসছে, মই আসছে। কিন্তু ছোট ছেলেদের সে ছিল মহা প্রিয়পাত্র।

বয়স্ক ব্যক্তিদের হাসি দেখিয়া সে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিত, হুঁ। কি রকম, হাসছ যে?

এই দাদা, একটা রসের কথা হচ্ছিল।

হুঁ। তা বটে, তা তোমার রসের কথা—ও তোমার রস খাওয়ারই সমান।

একজন হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বলিয়া দিত, না দাদা, তোমাকে দেখেই সব হাসছিল, বলছিল, মই আসছে।

চক্রবর্তী আকর্ণ দাঁত মেলিয়া হাসিয়া উত্তর দিত, হুঁ, তা বটে। তা কাঁধে চড়লে স্বগ্গে যাওয়া যায়। বেশ পেট ভরে খাইয়ে দিলেই, বাস, স্বগগে পাঠিয়ে দোব।

আর পত্তনে রসাতল, কি বল দাদা?

চক্রবর্তী মনে মনে উত্তর খুঁজিত। কিন্তু তাহার পূর্বেই চক্রবর্তীর নজরে পড়িত, অল্প দূরে একটা গলির মুখে ছেলের দল তাহাকে ইশারা করিয়া ডাকিতেছে। আর চক্রবর্তীর উত্তর দেওয়া হইত না। সে কাজের ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িত।

কোনোদিন রায়েদের বাগানে, কোনোদিন মিঞাদের বাগানে ছেলেদের দলের সঙ্গে গিয়া হাজির হইয়া আম জাম বা পেয়ারা আহরণে মত্ত থাকিত। সরস পরিপক্ব ফলগুলির মিষ্ট গন্ধে সমবেত মৌমাছি বোলতার দল ঝাঁক বাঁধিয়া চারিদিক হইতে আক্রমণের ভয় দেখাইলেও সে নিরস্ত হইত না; টুপটাপ করিয়া মুখে ফেলিয়া চোখ বুজিয়া রসাস্বাদনে নিযুক্ত থাকিত।

ছেলেরা কলরব করিত, ওই, অ্যাঁ—তুমি যে সব খেয়ে দিলে, অ্যাঁ! সে তাড়াতাড়ি ডালটা নাড়া দিয়া কতকগুলা ঝরাইয়া দিয়া আবার গোটা দুই মুখে পুরিয়া বলিত, আঃ!

কেহ হয়তো বলিত, বাঃ পুন্ন কাকা, তুমি যে খেতে লেগেছ? ঠাকুরপুজো করবে না?

পূর্ণ উত্তর দিত, ফল ফল, ভাত মুড়ি তো নয়, ফল ফল।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে যেদিন এ কাহিনীর আরম্ভ, সেদিন স্থানীয় ধনী শ্যামাদাসবাবুর বাড়িতে এক বিরাট শান্তি-স্বস্ত্যয়ন উপলক্ষে ছিল ব্রাহ্মণ-ভোজন। শ্যামাদাসবাবু সন্তানহীন, একে একে পাঁচ-পাঁচটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা গিয়াছে। ইহার পূর্বেও বহু অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, কোনো ফল হয় নাই। এবার শ্যামাদাসবাবু বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু স্ত্রী শিবরানী সজল চক্ষে অনুরোধ করিল, আর কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখ; তারপর আমি বারণ করব না, নিজে আমি তোমার বিয়ে দেব।

শিবরানী তখন আবার সন্তানসম্ভবা। শ্যামাদাসবাবু সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন। শুধু তাই নয়, এবার তিনি এমন ধারা ব্যবস্থা করিলেন যে, সে ব্যবস্থা যদি নিষ্ফল হয় তবে যেন শিবরানীর পুনরায় অনুরোধের উপায় আর না থাকে। কাশী, বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর এবং স্বগৃহে একসঙ্গে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইল। স্বস্ত্যয়ন বলিলে ঠিক হয় না, পুত্রেষ্টিযজ্ঞই বোধ হয় বলা উচিত।

ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজনও বিপুল। শ্যামাদাসবাবু গলবস্ত্র হইয়া প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রত্যেক ব্রাহ্মণটির নিকট গিয়া দেখিতেছেন—কি নাই, কি চাই। একপাশে পূর্ণ চক্রবর্তীও বসিয়া গিয়াছে, সঙ্গে তাহার তিনটি ছেলে। কিন্তু পাতা অধিকার করিয়া আছে পাঁচটি। বাড়তি পাতাটিতে অন্ন ব্যঞ্জন মাছ স্তূপীকৃত হইয়া আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাতাটি তাহার ছাঁদা; তাহার নাকি এটিতে দাবি আছে। সে-ই শ্যামদাসবাবু প্রতিনিধি হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিয়াছে, আবার আহারের সময় আহ্বান জানাইয়াও আসিয়াছে। তাহারই পারিশ্রমিক এটি। শুধু শ্যামাদাসবাবুর বাড়িতে এবং এই ক্ষেত্র-বিশেষটিতেই নয়, এই কাজটি তাহার যেন নির্দিষ্ট কাজ, এখানে পঞ্চ গ্রামের মধ্যে যেখানে যে বাড়িতেই হউক এবং যত সামান্য আয়োজনের ব্রাহ্মণ-ভোজন হউক না কেন, পূর্ণ চক্রবর্তী আপনিই সেখানে গিয়া হাজির হয়; হাঁটু পর্যন্ত কোনোরূপে ঢাকে এমনই বহরের তাহার পোশাকী কাপড়খানি পরিয়া এবং বাপ-পিতামহের আমলের রেশমের একখানি কালী-নামাবলী গায়ে দিয়া হাজির হইয়া বলে, হুঁ, তা কর্তা কই গো, নেমন্তন্ন কি রকম হবে একবার বলে দেন? ওঃ, মাছগুলো যে বেশ তেলুক-তেলুক ঠেকছে! হুই হুই! নিয়েছিল এক্ষুনি চিলে!

চিলটা উড়িতেছে দূর আকাশের গায়, পূর্ণ চক্রবর্তী সেটাকেই তাড়াইয়া গৃহস্থের হিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয় দেয়। দুর্দান্ত শীতের গভীর রাত্রি পর্যন্ত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়া সে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেরে; প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরেও আহারের আহ্বান জানাইতে চক্রবর্তী ছেঁড়া চটি পায়ে, মাথায় ভিজা গামছাখানি চাপাইয়া কর্তব্য সারিয়া আসে; সেই কর্মের বিনিময়ে এটি তাহার পারিশ্রমিক। যাক।

শ্যামাদাসবাবু আসিয়া পূর্ণকে বলিলেন, আর কয়েকখানা মাছ দিক চক্রবর্তী?

চক্রবর্তীর তখন খানবিশেক মাছ শেষ হইয়া গিয়াছে ; সে একটা মাছের কাঁটা চুষিতেছিল, বলিল, আজ্ঞে না, মিষ্টি-টিষ্টি আবার আছে তো। হরে ময়রার রসের কড়াইয়ে ইয়া-ইয়া ছানাবড়া ভাসছে, আমি দেখে এসেছি।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, সে তো হবেই ; একটা মাছের মুড়ো ?

পূর্ণ পাতাখানা পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল, ছোট দেখে।

মাছের মুড়াটা শেষ করিতে করিতে ওপাশে তখন মিষ্টি আসিয়া পড়িল।

চক্রবর্তী ছেলেদের বলিল, হুঁ, বেশ করে পাতা পরিষ্কার কর সব, হুঁ। নইলে নোন্তা ঝোল লেগে খারাপ লাগবে খেতে। এঃ, তুই যে কিছুই খেতে পারলি না, মাছসুদ্ধ পড়ে আছে!—বলিয়া ছোট ছেলেটার পাতার আধখানা মাছও সে নিজের পাতে উঠাইয়া লইল। মাছখানা শেষ করিয়া সে গলাটা ঈষৎ উঁচু করিয়া মিষ্টি পরিবেশনের দিকে চাহিয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে হাঁকিতেছিল, এই দিকে।

ওপাশে সকলে তাহাকে দেখিয়া টেপাটেপি করিয়া হাসিতেছিল, একজন বলিল, চোখ দুটো দেখ, চোখ দুটো দেখ!

উঃ, যেন চোখ দিয়ে গিলছে!

আমি তো ভাই, কখনও ওর পাশে খেতে বসি না। উঃ, কি দৃষ্টি ?

ততক্ষণে মিষ্টান্ন চক্রবর্তীর পাতার সম্মুখে গিয়া হাজির হইয়াছে।

চক্রবর্তী মিষ্টান্ন-পরিবেশকের সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল, ছাঁদার পাতে আমি আটটা মিষ্টি পাব।

বাঃ, সে তো চারটে করে মিষ্টি পান মশায়।

সে দুটো করে যদি পাতে পড়ে, তবে চারটে। আর চারটে যখন পাতে পড়ছে, তখন আটটা পাব না, বাঃ!

শ্যামাদাসবাবু আসিয়া বলিলেন, ষোলোটা দাও ওঁর ছাঁদার পাতে। ভদ্রলোক বিনি-মাইনেতে নেমন্তন্ন করে আসেন ; দাও দাও, ষোলোটা দাও।

পূর্ণ চক্রবর্তী আঁচল খুলিতে খুলিতে বলিল, আঁচলে দাও, আমার আঁচলে দাও।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, চক্রবর্তী, কাল সকালে একবার আসবে তো ? কেমন, এখানে এসেই জল খাবে!

যে আজ্ঞে, তা আসব।

ওপাশ হইতে কে বলিল, চক্রবর্তী বাবুকে ধরে পড়ে তুমি বিদূষক হয়ে যাও—আগেকার রাজাদের যেমন বিদূষক থাকত।

চক্রবর্তী গামছায় ছাঁদার পাতাটা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, হুঁ। তা তোমার

হলে তো ভালোই হয়; আর তোমার, ব্রাহ্মণের লজ্জাই বা কি? রাজা-জমিদারের বিদূষক হয়ে যদি ভালোমন্দটা—

বলিতে বলিতেই হাসিয়া উঠিল।

বাড়িতে আসিয়া ছাঁদা-বাঁধা গামছাটা বড় ছেলের হাতে দিয়া চক্রবর্তী বলিল, যা, বাড়িতে দিগে যা।

ছেলেটা গামছা হাতে লইতেই মেজমেয়েটা বলিল, মিষ্টিগুলো?

সে আমি নিয়ে যাচ্ছি, যা।

অ্যাঁ, তুমি লুকিয়ে রাখবে। ষোলোটা মিষ্টি কিন্তু গুনে নোব, হ্যাঁ।

আরে আরে, এ বলছে কি! ষোলোটা কোথা রে বাপু! দিলে তো আটটা, তাও কত ঝগড়া করে।

মা, মা! দেখ, বাবা মিষ্টিগুলো লুকিয়ে রেখেছে, অ্যাঁ।

চক্রবর্তী-গৃহিণী যাহাকে বলে রূপসী মেয়ে। দারিদ্র্যের শতমুখী আক্রমণেও সে রূপকে জীর্ণ করিতে পারে নাই। দেহ শীর্ণ, চুল রুক্ষ, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র; তবুও হৈমবতী যেন সত্যিই হৈমবতী। কাঞ্চননিভ দেহবর্ণ দেখিয়া সোনার প্রতিমা বলিতেই ইচ্ছা করে। চোখ দুইটি আয়ত সুন্দর, কিন্তু দৃষ্টি তাহার নিষ্ঠুর মায়াহীন। মায়াহীন অন্তর ও রূপময়ী কায়া লইয়া হৈম যেন উজ্জ্বল বালুস্তরময়ী মরুভূমি; প্রভাতের পর হইতেই দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মরুর মতোই প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠে।

হৈমবতী আসিয়া দাঁড়াইতেই চক্রবর্তী সভয়ে মেয়েকে বলিল, বলছি, তুই নিয়ে যেতে পারবি না; না, মেয়ে চেঁচাতে—

হৈমবতী কঠোর স্বরে বলিল, দাও।

চক্রবর্তী আঁচলের খুঁটটি খুলিয়া হৈমর সম্মুখে ধরিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ছেলেটা বলিল, বাবাকে আর দিও না, মা। আজ যা খেয়েছে বাবা, উঃ! আবার কাল সকালে বাবু নেমন্তন্ন করেছে বাবাকে, মিষ্টি খাওয়াবে।

হৈম কঠিন স্বরে বলিল, বেরো বলছি আমার সুমুখ থেকে, হতভাগা ছেলে! বাপের প্রতি ভক্তি দেখ! তোরা সব মরিস না কেন, আমি যে বাঁচি!

পূর্ণ এবার সাহস করিয়া বলিল, দেখ না, ছেলের তরিবত যেন চাষার তরিবত!

হৈম বলিল, বাপ যে চামার, লোভী চামারের ছেলে চাষাও যে হয়েছে সেটুকুও ভাগ্যি মেনো। লেখাপড়া শেখাবার পয়সা নেই, রোগে ওষুধ নেই, গায়ে জামা নেই, তবু মরে না ওরা! রাক্ষসের ঝাড়, অথণ্ড পেরমাই!

চক্রবর্তী চুপ করিয়া রহিল। হৈম যেন আগুন ছড়াইতে চলিয়া গেল। চক্রবর্তী ছেলেটাকে বলিল, দেখ দেখিরে, এক টুকরো হত্তুকি কি সুপুরি এককুচি যদি পাস। তোর মার কাছে যেন চাস নি বাবা।

সন্ধ্যার পর চক্রবর্তী হৈমর কাছে বসিয়া ক্রমাগত তাহার তোষামোদ করিতে আরম্ভ করিল। হৈম কোলের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াইতেছিল। চক্রবর্তী এবং ছেলেরা আজ নিমন্ত্রণ খাইয়াছে, রাত্রে আর রান্নার হাঙ্গামা নাই, যে ছাঁদাটা আসিয়াছে তাহাতে হৈম এবং কোলের ছেলেটারও চলিয়া গিয়াছে।

বহু তোষামোদেও হৈম যেন তেমন প্রসন্ন হইল না, অন্তত চক্রবর্তীর তাই মনে হইল; সে মনের কথা বলিতে সাহস পাইল না। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে, রাত্রে কয়েকটা ছানাবড়া সে খায়। তাহার তৃপ্তি হয় নাই, বুকের মধ্যে লালসা ক্রমবর্ধমান বহ্নি-শিখার মতো জ্বলিতেছে।

ধীরে ধীরে হৈমবতী ঘুমাইয়া পড়িল। শীর্ণ দুর্বল দেহ, তাহার উপর আবার সে সন্তানসম্ভবা, সন্ধ্যার পরই শরীর যেন তাহার ভাঙিয়া পড়ে। ছেলেগুলাও ঘুমাইয়াছে। চক্রবর্তী হৈমর দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল, হাঁ, হৈম ঘুমাইয়াছে। চক্রবর্তী আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, হৈমর আঁচল হইতে বাঁধা কয়টা চাবির গোছা খুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই ছেলেরা নাচিতে নাচিতে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, ছানাবড়া খাব। বড়ছেলেটা ঘুর-ঘুর করিয়া বার বার মায়ের কাছে আসিয়া বলিতেছিল, আমাকে কিন্তু একটা গোটা দিতে হবে মা।

হৈম বিরক্ত হইয়া বলিল, সব—সব—সবগুলো বের করে দিচ্ছি, একটা কেন?

সে চাবি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই একটা রূঢ় বিস্ময়ের আঘাতে স্তব্ধ ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে শিকাটাতে মিষ্টিগুলি ঝুলানো ছিল, সেটা কিসে কাটিয়া ফেলিয়াছে, মিষ্টান্নগুলির অধিকাংশই কিসে খাইয়া গিয়াছে; মাত্র গোটা তিনচার মেঝের উপর পড়িয়া আছে, তাও সেগুলি রসহীন শুষ্ক, নিঃশেষে রস শোষণ করিয়া লইয়া ছাড়িয়াছে। ছেঁড়া শিকটাকে সে একবার তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, কাটা নয়, টানিয়া কিসে ছিঁড়িয়াছে। অতি নিষ্ঠুর কঠিন হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

বাবু বলিলেন, চক্রবর্তী, গিন্নীর একান্ত ইচ্ছে যে, তুমি এবার তাঁর আঁতুড়-দোরে থাকবে।

এখানকার প্রচলিত প্রথায় সূতিকা-গৃহের দুয়ারের সম্মুখে রাত্রে ব্রাহ্মণ রাখিতে

হয়। চক্রবর্তীর সন্তানদের মধ্যে সব কটিই জীবিত, চক্রবর্তী-গৃহিণী নিখুঁত প্রসূতি ; তাহার সূতিকা-গৃহের দুয়ারে চক্রবর্তীই শুইয়া থাকে। তাই শিবরানী এবার এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, কল্যাণের এমনই সংস্র খুঁটিনাটি লইয়া সে অহরহ ব্যস্ত। শ্যামদাস বাবুও তাহার কোনো ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিবেন না।

চক্রবর্তী বলিল, হুঁ, তা আজ্ঞে—

একজন মোসায়েব বলিয়া উঠিল, তা, না না—কিছু নেই চক্রবর্তী। দিব্যি এখানে এসে রাজভোগ খাবে রাত্রে, ইয়া পুরু বিছানা, তোফা ভরা পেটে, বুঝেছ ?—বলিয়া সে ঘড়-ঘড় করিয়া নাক ডাকাইয়া ফেলিল।

আহার ও আরামের বর্ণনায় পুলকিত চক্রবর্তী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হুঁ, তা হুজুর যখন বলছেন, তখন না পারলে হবে কেন ?

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, বোসো তুমি, আমি জল খেয়ে আসছি। তোমারও জলখাবার আসছে।—বলিয়া তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

একজন চাকর একখানা আসন পাতিয়া দিয়া মিষ্টান্নপরিপূর্ণ একখানা থালা নামাইয়া দিল।

একজন বলিল, খাও চক্রবর্তী।

হুঁ। তা একটু জল, হাতটা ধুয়ে ফেলতে হবে।

আর একজন পারিষদ বলিল, গঙ্গা গঙ্গা বলে বসে পড় চক্রবর্তী। অপবিত্র পবিত্রো বা, ওঁ বিষ্ণু স্মরণ করলেই সব শুদ্ধ, বসে পড়।

গ্লাসের জলেই একটা কুলকুচা করিয়া খানিকটা হাতে বুলাইয়া লইয়া চক্রবর্তী লোলুপভাবে থালার সম্মুখে বসিয়া পড়িল।

পাশের ঘরে জলযোগ শেষ করিয়া আসিয়া শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, পেট ভরল চক্রবর্তী ?

চক্রবর্তীর মুখে তখন গোটা একটা ছানাবড়া। একজন বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে, কথা বলবার অবসর নেই চক্রবর্তীর এখন।

সেটা শেষ করিয়া চক্রবর্তী বলিল, আজ্ঞে পরিপূর্ণ। তিল ধরবার জায়গা নেই আর পেটে।

সে উঠিয়া পড়িল।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, তোমার কল্যাণে যদি মনস্কামনা আমার সিদ্ধ হয় চক্রবর্তী, তবে দশ বিঘে জমি আমি তোমাকে দোব। আর আজীবন তুমি সিংহবাহিনীর একটা প্রসাদ পাবে। তা হলে তোমার কথা তো পাকা, কেমন ?

সিংহবাহিনীর প্রসাদ কল্পনা করিয়া চক্রবর্তী পুলকিত হইয়া উঠিল। সিংহবাহিনীর ভোগের প্রসাদ—সে যে রাজভোগ !

হুঁ, তা পাকা বইকি ! হুজুরের—

কথা অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া সে বলিয়া উঠিল, দেখি, দেখি, ওহে, দেখি ! চোখ তাহার যেন জলজল করিয়া উঠিল।

খানসামাটা শ্যামাদাসবাবুর উচ্ছিষ্ট জলখাবারের থালাটা লইয়া সম্মুখ দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল। একটা অভুক্ত ক্ষীরের সন্দেশ ও মালপোয়া থালাটার উপর পড়িয়া ছিল। চক্রবর্তীর লোলুপতা অকস্মাৎ যেন সাপের মতো বিবর হইতে ফণা বিস্তার করিয়া বাহির হইয়া বিষ উদ্গার করিল। চক্রবর্তী স্থান কাল সমস্ত ভুলিয়া বলিয়া উঠিল, দেখি দেখি, ওহে, দেখি দেখি !

শ্যামাদাসবাবু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, কর কি, কর কি, এঁটো, ওটা এঁটো ! নতুন এনে দিক !

চক্রবর্তী তখন থালাটা টানিয়া লইয়াছে। ক্ষীরের সন্দেশটা মুখে পুরিয়া বলিল, আজ্ঞে, রাজার প্রসাদ !

আর সে বলিতে পারিল না, আপনার অন্যায়টা মুহূর্তে তাহার বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আর উপায় ছিল না, বাকিটাও আর ফেলিয়া রাখা চলে না। লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সেটাও কোনোরূপে গলাধঃকরণ করিয়া তাড়াতাড়ি কাজের ছুতা করিয়া সে পালাইয়া আসিল।

বাড়িতে তখন মরুতে যেন ঝড় বহিতেছে। হৈম মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে, ছোট ছেলেগুলা কাঁদিতেছে। বড়টা কোথায় পলাইয়াছে।

মেজমেয়েটা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মিষ্টিগুলো কিসে খেয়ে দিয়েছে, তাই দাদা ঝগড়া করে মাকে মেরে পালাল। মা পড়ে গিয়ে—

কথার শেষাংশ তাহার কান্নায় ঢাকিয়া গেল। চক্রবর্তীর চোখে জল আসিল ; জলের ঘটি ও পাখা লইয়া সে হৈমর পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে করিতে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে হৈমর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চেতনা হইতেই হৈম স্বামীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ছি ছি ছি ! তোমাকে কি বলব আমি, ছিঃ !

চক্রবর্তী হৈমর পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু হৈম চীৎকার করিয়া উঠিল, মাথা ঠুকে মরব আমি, ছাড়, পা ছাড়।

সমস্ত দিন হৈম নির্জীবের মত পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার দিকে সে সুস্থ হইয়া উঠিলে চক্রবর্তী সমস্ত কথা বলিয়া কহিল, তোমার বলছ আবার ওই সময়েই ! তা হলে না হয় কাল বলে দেব যে পারব না আমি।

১—৩২

হৈম চীৎকার করিয়া উঠিল, না না না। মরুক, মরুক, হয়ে মরুক আমার। আমি খালাস পাব। জমি পেলে অন্যগুলো তো বাঁচবে।

শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহেই। সেদিন সন্ধ্যায় শ্যামাদাসবাবুর লোক আসিয়া চক্রবর্তীকে ডাকিল, চলুন আপনি, গিন্নীমায়ের প্রসববেদনা উঠেছে।

চক্রবর্তী বিব্রত হইয়া উঠিল ; হৈমরও শরীর আজ কেমন করিতেছে।

হৈম বলিল, যাও তুমি।

কিন্তু—

আমাকে আর জ্বালিও না বাপু, যাও। বাড়িতে বড় খোকা রয়েছে, যাও তুমি।

চক্রবর্তী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। জমিদার-বাড়ি তখন লোকজনে ভরিয়া গিয়াছে। শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, এস চক্রবর্তী, এস। আমি বড় ব্যস্ত এখন। তুমি রান্নাবাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিও।

চক্রবর্তী সটান গিয়া তখনই রান্নাশালাতে উঠিল।

হুঁ, ঠাকুর, কী রান্না হচ্ছে আজ? বাঃ, খোসবুই তো খুব উঠেছে! কী হে ওটা, মাছের কালিয়া না মাংস?

মাংস। মায়ের পুজো দিয়ে বলি দেওয়া হয়েছে কিনা।

হুঁ, তা তোমার রান্নাও খুব ভালো। তার ওপর তোমার বাদলার দিন। কত দূর, বলি দেরি কত? দাও না, দেখি একটু চেখে।

সে একখানা শালপাতা ছিঁড়িয়া ঠোঙা করিয়া একেবারে কড়াই ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল। ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিল, আচ্ছা লোভ তোমার কিন্তু চক্রবর্তী!

হুঁ, তা বলেছ ঠিক। তা একটু বেশি। তা বটে।

একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল, সিদ্ধ হতে দেরি আছে নাকি?

হাতাতে করিয়া খানিকটা অর্ধসিদ্ধ মাংস তাহার ঠোঙাতে দিয়া ঠাকুর বলিল, এই দেখ, বললে তো বিশ্বাস করবে না। নাও, হুঁঃ।

সেই গরম ঝোলই খানিকটা সড়াত করিয়া টানিয়া লইয়া চক্রবর্তী বলিল, হুঁ। বাঃ, ঝোলটা বেড়ে হয়েছে! হুঁ, তা তোমার রান্না যাকে বলে উৎকৃষ্ট।

ঠাকুর আপন মনেই কাজ করিতেছিল, সে কোনো উত্তর দিল না। চক্রবর্তী আবার বলিল, হুঁ। তা তোমার, এ চাকলায় তো কাউকে তোমার জুড়ি দেখলাম না। মাংসটা সিদ্ধ এখনও হয় নি, তবে তোমার গিয়ে খাওয়া চলছে।

ঠাকুর বলিল, চক্রবর্তী, তুমি এখন যাও এখান থেকে। খাবার হলে খবর দেবে চাকররা। আমাকে কাজ করতে দাও। যাও, ওঠ।

চক্রবর্তী উঠিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই সময়েই তাহার বড় ছেলেটা আসিয়া ডাকিল, বাবা!

চক্রবর্তী উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, কি রে?

একবার বাড়ি এস। ছেলে হয়েছে।

তোর মা, তোর মা কেমন আছে?

ভালোই আছে গো। তবে দাই-টাই কেউ নেই, দাই এসেছে বাবুদের বাড়ি; নাড়ী কাটতে লোক চাই।

চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি ছেলের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

হৈম!

ভয় নেই, ভালোই আছি। তুমি শুদ্দুরদের দাইকে ডাক দেখি, নাড়ী কেটে দিয়ে যাক। আমাদের দাইকে তো পাওয়া যাবে না।

তাহাই হইল। দাইটা নাড়ী কাটিয়া বলিল, সোন্দর খোকা হইচে বাপু, মা-বাপ সোন্দর না হলে কি ছেলে সোন্দর হয়! মা কেমন—তা দেখতে হবে!

হৈম বলিল, যা যা, বকিস নি বাপু; কাজ হল তোর, তুই যা।

চক্রবর্তী বলিল, হুঁ, তা হলে, তাই তো! খোকা যাক, বলে আসুক বাবুকে, অন্য লোক দেখুন ওঁরা।

হৈম বলিল, দেখ, জ্বালিও না আমাকে। যাও বলছি, যাও।

চক্রবর্তী আবার অন্ধকারের মধ্যে বাবুদের বাড়ির দিকে চলিল।

মধ্যরাত্রে জমিদার-বাড়ি শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। শিবরানী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

পূর্ব হইতেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত ছিল, সে-ই যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া নাড়ী কাটিল। গরম জলে শিশুর শরীরের ক্লেদাদি ধুইয়া মুছিয়া দাইয়ের কোলে শিশুটিকে সমর্পণ করিয়া সে যখন বিদায় লইল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

প্রভাতে চক্রবর্তী বাড়ি আসিতেই হৈম বলিল, ওগো, ছেলেটার ভোররাত্রে যেন জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে।

চক্রবর্তী চমকিয়া উঠিল, বলিল, হুঁ, তা—

অবশেষে অনুযোগ করিয়া বলিল, বললাম তখন, যাব না আমি। তা তুমি একেবারে আগুন হয়ে উঠলে! কিসে যে কি হয়—হুঁ!

হৈম বলিল, ও কিছু না, আপনি সেরে যাবে। এখন পয়সা-টাকের সাবু কি দুধ

দুধ যদি একটু পাও তো দেখ দেখি। আমাকে কাটলেও তো এক ফোঁটা দুধ বেরবে না।

পয়সা ছিল না, চক্রবর্তী প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বাবুদের বাড়ির দিকেই চলিল, দুধের জন্য। কাছারি-বাড়িতে ঘটিটি হাতে দাঁড়াইয়া সে বাবুকে খুঁজিতেছিল। বাবু ছিলেন না। লোকজনও সব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চলাফেরা করিতেছে। কেহ চক্রবর্তীকে লক্ষ্যই করিল না।

খানসামাটা বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইতেছিল, সে চক্রবর্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আজ আর পেসাদ-টেসাদ মিলবে না ঠাকুর; যাও, বাড়ি যাও।

চক্রবর্তী ম্লানমুখে ধীরে ধীরে বারান্দা হইতে নামিয়া আসিল। একজন নিম্ন-শ্রেণীর ভৃত্য একটা আড়াল দেখিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছিল, চক্রবর্তী তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ বাবা, ছেলের জন্যে গাই দোয়া হয় নি?

সে উত্তর দিল, কেন ঠাকুর, খারস্থ খাবে নাকি? আচ্ছা পেটুক ঠাকুর যা হোক! না, গাই দোয়া হয় নি; বাড়িতে ছেলের অসুখ, ওসব হবে না এখন, যাও।

শিশুর অসুখ বোধ হয় শেষরাত্রেই আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু বোঝা যায় নাই। সারারাত্রিব্যাপী যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শিবরানীও এলাইয়া পড়িয়াছিল, রাত্রি-জাগরণক্লিষ্টা দাইটাও ঘুমাইয়াছিল।

প্রভাতে, বেশ একটু বেলা হইলে, শিবরানী উঠিয়া বসিয়া ছেলে কোলে লইয়াই আশঙ্কায় চমকিয়া উঠিলেন। এ কি, ছেলে যে কেমন করিতেছে! তাহার পূর্বের সন্তানগুলিও তো এমনই ভাবেই—! চোখের জলে শিবরানীর বুক ভাসিয়া গেল। শিশুর শুভ্রপুষ্পতুল্য দেহবর্ণ যেন ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শিবরানী আর্তস্বরে ডাকিল, যমুনা, একবার বাবুকে ডেকে দে তো!

শ্যামাদাসবাবু আসিতেই সে বলিল, ডাক্তার ডাকাও, ছেলে কেমন হয়ে গেছে! সেই অসুখ!

শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দুর্গা দুর্গা!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন। স্থানীয় ডাক্তার তৎক্ষণাৎ আসিল এবং তাহার পরামর্শমতো শহরেও লোক পাঠানো হইল বিচক্ষণ চিকিৎসকের জন্য। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, শিবরানীর আশঙ্কা সত্য; সত্যই শিশু অসুস্থ। ধীরে ধীরে শিশুর দেহবর্ণ হইতে আকৃতি পর্যন্ত যেন কেমন অস্বাভাবিক হইয়া

আসিতেছে। এই সর্বনাশা রোগেই শিবরানীর শিশুগুলি এমনই করিয়াই সূতিকা-গৃহে একে একে বিনষ্ট হইয়াছে।

অপরাহ্নে সদর হইতে বড় ডাক্তার আসিয়া শিশুকে কিছুক্ষণ দেখিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, চলুন, আমার দেখা হয়েছে।

দাইটা বলিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু, ছেলে—

তাহার প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্বেই ডাক্তার বলিল, ওষুধ দিচ্ছি।

শ্যামাদাসবাবুর সঙ্গে ডাক্তার বাহির হইয়া গেল।

শ্যামাদাসবাবুর মাসীমা সূতিকা-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাইকে বলিলেন, কই, ছেলে নিয়ে আয় তো দেখি!

ছেলের অবস্থা দেখিয়া তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আ আমার কপাল রে!—বলিয়া ললাটে করাঘাত করিলেন। ঘরের মধ্যে শিবরানী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল।

মাসীমা আপন মনেই বলিলেন, আর ও বার করে দিতে হয়েছে। কি করেই বা বলি! আর পোয়াতীর কোলেই বা—

ডাক্তার শ্যামাদাসবাবুকে বলিল, কিছু মনে করবেন না শ্যামাদাসবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

বলুন।

ডাক্তার শ্যামাদাসবাবুর যৌবনের ইতিহাস প্রশ্ন করিয়া সংগ্রহ করিয়া বলিল, আমিও তাই ভেবেছিলাম। ওই হল আপনার সন্তানদের অকাল-মৃত্যুর কারণ।

তা হলে ছেলেটা কি—

না, আশা আমি দেখি না।—বলিয়া ডাক্তার বিদায় হইল।

শ্যামাদাসবাবু বাড়ির মধ্যে আসিতেই মাসীমা আপনার মনের কথাটা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, নইলে কি পোয়াতীর কোলে ছেলে মরবে? সে যে দারুণ দোষ হবে বাবা। আচার-আচরণগুলোও মানতে হবে তো।

আচার রক্ষা করিতে হইলে বিচার করার কোনো প্রয়োজন হয় না; এবং হিন্দুর সংসারে আচারের উপরেই নাকি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শিবরানীর কোল শূন্য করিয়া দিয়া শিশুকে সূতিকা-গৃহের বাহিরে বারান্দায় মৃত্যু-প্রতীক্ষায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তাহার কাছে রহিল দাই, এবং প্রহরায় রহিল ব্রাহ্মণ, আর মাথার শিয়রে রহিল দেবতার নির্মাল্যের রাশি। ঘরের মধ্যে পুত্রশোকাতুরা শিবরানীর সেবা ও সান্ত্বনার জন্য রহিল যমুনা-ঝি।

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি। চক্রবর্তী বসিয়া ঘন ঘন তামাক খাইতেছিল। তাহার ঘরেও শিশুটি অসুস্থ; কিন্তু সে সারিয়া উঠিবে। চক্রবর্তী মধ্যে মধ্যে আপন মনেই বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, বিধিলিপি! তাহার শিশুটি মরিয়া যদি এটি বাঁচিত, তবে চক্রবর্তী অন্তত বাঁচিত। দশ বিঘা জমি আর সিংহবাহিনীর প্রসাদ নিত্য একথালা! ভাগ্যের চিকিৎসা কি আর ডাক্তারে করিতে পারে!

শিশুটি মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ কণ্ঠে অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে।

চক্রবর্তী দাইটাকে বলিল, একটু জল-টল মুখে দে রে-বাপু!

নিদ্রাকাতর দাইটা বলিল, জল কি যাবে গো ঠাকুর? তা বলছ, দিই।

সে উঠিয়া ফোঁটা দুই জল দিয়া শিশুর অধর ভিজাইয়া দিল। তারপর শুইতে শুইতে বলিল, ঘুমোও ঠাকুর, তোমার কি আর ঘুম-টুম নাই!

চক্রবর্তীর চক্ষে সত্যই ঘুম নাই। সে বসিয়া আকাশজোড়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আপন ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল। তাহার ভাগ্যাকাশও এমনই অন্ধকার। আঃ, ছেলেটা যদি জাদুমন্ত্রে বাঁচিয়া উঠে! চক্রবর্তী পৈতা ধরিয়া শিশুর ললাটখানি একবার স্পর্শ করিল। অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে সর্বাঙ্গ তাহার থরথর করিয়া কাঁপে।

না না, সে হয় না। জানিতে পারিলে সর্বনাশ হইবে। দেখিতে দেখিতে তাহার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিল। সে আবার তামাক খাইতে বসিল।

দাইটা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। ঘরের মধ্যেও শিবরানীর মৃদু ক্রন্দনধ্বনি আর শোনা যায় না। কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে চক্রবর্তী আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল; জ্বলন্ত অঙ্গারের প্রভায় চোখের মধ্যেও যেন তাহার আগুন জ্বলিতেছে।

উঃ, চিরদিনের জন্য তাহার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে! এ শিশুর প্রভাত হইতেই বিকৃত মূর্তি, তাহার শিশুও কুৎসিত নয়, দারিদ্র্যের সন্তান হইলেও জননীর কল্যাণে সে রূপ লইয়া জন্মিয়াছে। সমস্ত সম্পত্তি তাহার সন্তানের হইবে! উঃ!

পাপ যেন সম্মুখে অদৃশ্য কায়া লইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছিল। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আলোকিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চক্রবর্তীর চোখের সম্মুখে ঝলমল করিতেছে। চক্রবর্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। শিশুর নিকট আসিয়া কিন্তু আবার তাহার ভয় হইল। কিন্তু সে এক মুহূর্ত। পরমুহূর্তে সে মৃতপ্রায় শিশুকে বস্ত্রাবৃত করিয়া লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িল।

অদ্ভুত, সে যেন চলিয়াছে অদৃশ্য বায়ুপ্রবাহের মতো!—নিঃশব্দে লঘু দ্রুত গতিতে। অন্ধকার পথেও আজ সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ কেহ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করে না, তাহারও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ভাঙা ঘর। চারিদিকে প্রাচীরও সর্বত্র নাই।

হৈমর সূতিকাগৃহের দরজাও নাই, একটা আগড় দিয়া কোনোরূপে আগলানো আছে। হৈমও গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

চক্রবর্তী আবার বাতাসের মতো লঘু ক্ষিপ্র গতিতে ফিরিল।

দাইটা তখনও নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।

রোগগ্রস্ত শিশু, মৃত্যু-রোগগ্রস্ত নয়। সে থাকিতে থাকিতে অপেক্ষাকৃত সবল ক্রন্দনে আপনার অভিযোগ জানাইল। দাইটার কিন্তু ঘুম ভাঙিল না। চক্রবর্তী ঘুমের ভান করিয়া কাঠ মারিয়া পড়িয়া রহিল।

শিশু আবার কাঁদিল।

ঘরের মধ্যে শিবরানীর অস্ফুট ক্রন্দন এবার যেন শোনা গেল।

শিশু আবার কাঁদিল।

এবার যমুনা ঈষৎ দরজা খুলিয়া বলিল, দাই, ও দাই! ওমা, নাক ডাকছে যে! ঠাকুরও দেখছি মড়ার মতো ঘুমিয়েছে! ও দাই!

দাইটা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। যমুনা বলিল, এই বুঝি তোর ছেলে আগলানো! ছেলে যে কাতরাচ্ছে, মুখে একটু করে জল দে।

দাইটা তাড়াতাড়ি শিশুর মুখে জল দিল; শুষ্ককণ্ঠ শিশু ঠোঁট চাটিয়া জলটুকু পান করিয়া আবার যেন চাহিল। দাই আবার দিল।

এবার সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, ওগো, জল খাচ্ছে গো ঠোঁট চেটে চেটে!

শিবরানী দুর্বল দেহে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, নিয়ে আয়, ঘরে নিয়ে আয় আমার ছেলে, কারও কথা আমি শুনব না।

প্রভাতে আবার লোক ছুটিল সদরে। এবার অন্য ডাক্তার আসিবে। মৃত্যুদ্বার হইতে শিশু ফিরিয়াছে। দেবতার দান, ব্রাহ্মণের প্রসাদ! চক্রবর্তী নাকি আপন শিশুর পরমায়ু রাজার শিশুকে দিয়াছে! হতভাগ্যের সন্তানটি মারা গিয়াছে। প্রায়ান্ধকার সূতিকা-গৃহে শিবরানী জ্বর-কাতর শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। তাহার ভাগ্য-দেবতা, তাহার হারানো মানিক!

দশ বিঘা জমি চক্রবর্তী পাইল। সিংহবাহিনীর প্রসাদও এক থালা করিয়া নিত্য সে পায়। হৈম অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছে। কিন্তু চক্রবর্তী সেই তেমনই করিয়াই বেড়ায়।

লোকে বলে, স্বভাব যায় না মলে।

চক্রবর্তী বলে, হুঁ, তা বটে। কিন্তু ছেলের দল দেখেছ, এক-একটা ছেলে যে একটা হাতির সমান।

হৈম ছেলেগুলিকে ইস্কুলে দিয়াছে। বড়ছেলেটি এখন ইতরের মতো কথা বলে না, কিন্তু বড় বড় কথা বলে, বাবার ব্যবহারে ইস্কুলে আমার মুখ দেখানো ভার মা। ছেলেরা যা-তা বলে। কেউ বলে, ভাঁড়ের বেটা খুরি। কেউ আবার দেখলেই সড়াত করে মুখে ঝোল টানে। তুমি বাপু, বারণ করে দিও বাবাকে।

হৈম সে কথা বলিতেই চক্রবর্তী সহসা যেন আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিল। তাহার অস্বাভাবিক রূপ দেখিয়া হৈমও চমকিয়া উঠিল।

চক্রবর্তী বলিল, চলে যাব, চলে যাব আমি সন্নেসী হয়ে।

ব্যাপারটা আরও অগ্রসর হইত। কিন্তু বাহির হইতে কে ডাকিল, চক্রবর্তী!

কে?

বাঁড়ুজ্জেরা পাঠালে হে। ওদের মেয়ের বাড়ি তত্ত্ব যাবে, তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে; ওরা কেউ যেতে পারবে না। লাভ আছে হে, ভালোমন্দ খাবে, বিদেয়টাও পাবে।

আচ্ছা, চল যাই।

চক্রবর্তী বাহির হইয়া পড়িল। বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ি গিয়া যেখানে মিষ্টি তৈয়ারি হইতেছিল সেখানে চাপিয়া বসিয়া বলিল, ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি। হুঁ, তা যেতে হবে বইকি! উনোনের আঁচটা একটু ঠেলে দিই, কি বল হে মোদকমশায়?

সে সতৃষ্ণ নয়নে কড়াইয়ের পাকের দিকে চাহিয়া রহিল।

বৎসর দশেক পর। শিবরানী হঠাৎ মারা গেলেন। লোকে বলিল, ভাগ্যবতী! স্বামী-পুত্তুর রেখে ডঙ্কা মেরে চলে গেল!

শ্যামাদাসবাবু শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিপুল আয়োজন আরম্ভ করিলেন। চক্রবর্তীর এখন ওইখানেই বাসা হইয়াছে। সকালবেলাতেই ঠুকঠুক করিয়া গিয়া হাজির হয়, বসিয়া বসিয়া আয়োজনের বিলি-বন্দোবস্ত দেখে, মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলে।

সেদিন বলিল, হুঁ, ছাঁদা একটা করে তো দেওয়া হবে। তা তোমার লুচিই বা কখানা আর তোমার মিষ্টিই বা কি রকম হবে?

একজন উত্তর দিল, হবে হবে। একখানা করে লুচি, এই চালুনের মতো। আর মিষ্টি একটা করে, তোমার লেডিকেনি, এই পাশ-বালিশের মতো, বুঝলে!

সকলে মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল। শ্যামাদাসবাবু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, একটু থাম তো সব। হ্যাঁ, কি হল, পাওয়া গেল না?

একজন কর্মচারীর সঙ্গে তিনি কথা কহিতেছিলেন। কর্মচারীটি বলিল, আজ্ঞে, তাদের বংশই নির্বংশ হয়ে গিয়েছে।

তা হলে অন্য জায়গায় লোক পাঠাও। অগ্রদানী না হলে তো শ্রাদ্ধ হয় না।

আচ্ছা, তাই দেখি। অগ্রদানী তো বড় বেশী নেই, দশ-বিশ ক্রোশ অন্তর একঘর আধঘর।

কে একজন বলিয়া উঠিল, তা আমাদের চক্রবর্তী রয়েছে, চক্রবর্তী, নাও না কেন দান, ক্ষতি কি? পতিত করে আর কে কি করবে তোমার?

শ্যামাদাসবাবুও ঈষৎ উৎসুক হইয়া বলিয়া উঠিলেন, মন্দ কি চক্রবর্তী! শুধু দান-সামগ্রী নয়, ভূ-সম্পত্তিও কিছু পাবে; পঁচিশ বিঘে জমি দেব আমি, আর তুমি যদি রাজী হও, তবে বছরে পঞ্চাশ টাকা জমিদারী সম্পত্তির মুনাফা দেব আমি, দেখ।—বলিয়াই তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া চাকরকে ডাকিলেন, ওরে, চক্রবর্তীকে জলখাবার এনে দে। কলকাতার মিষ্টি কি আছে, নিয়ে আয়।

শ্রাদ্ধের দিন সকলে দেখিল, শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিবরানীর শ্রাদ্ধ করিতেছে আর তাহার সম্মুখে অগ্রদান গ্রহণ করিবার জন্য দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছে পূর্ণ চক্রবর্তী।

তারপর গোশালায় বসিয়া তাহারই হাত হইতে গ্রহণ করিয়া চক্রবর্তী গোগ্রাসে পিণ্ড ভোজন করিল।

গল্পের এখানেই শেষ, কিন্তু চক্রবর্তীর কাহিনী এখানে শেষ নয়। সেটুকু না বলিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

লোভী, আহার-লোলুপ চক্রবর্তীর আপন সন্তানের হাতে পিণ্ড ভোজন করিয়াও তৃপ্তি হয় নাই। লুব্ধ দৃষ্টি লোলুপ রসনা লইয়া সে তেমনই করিয়াই ফিরিতেছিল। এই শ্রাদ্ধের চৌদ্দ বৎসর পর সে একদিন শ্যামাদাসবাবুর পায়ে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল। শ্যামাদাসবাবু তাঁহার দুই বৎসরের পৌত্রকে কোলে করিয়া শুষ্ক অশ্বত্থতরুর মতো দাঁড়াইয়া ছিলেন।

চক্রবর্তী তাঁহার দুইটি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, পারব না বাবু, আমি পারব না।

শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, না পারলে উপায় কি, চক্রবর্তী? আমি বাপ হয়ে তার শ্রাদ্ধের আয়োজন করছি, কচি মেয়ে—তার বিধবা স্ত্রী শ্রাদ্ধ করতে পারবে, আর তুমি পারবে না বললে চলবে কেন, বল? দশ বিঘে জমি তুমি এতেও পাবে।

শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিশু-পুত্র ও পত্নী রাখিয়া মারা গিয়াছে, তাহারই শ্রাদ্ধ হইবে।

চক্রবর্তী নিরুপায় হইয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল।

শ্রাদ্ধের দিন, গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল।

পুরোহিত বলিল, খাও হে চক্রবর্তী!

প্রোতমা

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়। আকাশে মেঘে বর্ষার সে ঘনঘোর রূপ আর নাই। মেঘের রঙও ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে, রৌদ্রের রঙেও পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। গত বৎসরের অনাবৃষ্টি ও অজন্মার পর এবার বর্ষা হইয়াছে ভালো, মাঠে ধানের রং কসকসে কালো, আর ঝাড়ে গোছেও সুন্দর পরিপুষ্ট। দেশে একটা প্রশান্ত ভাব। গৃহস্থবাড়িতে পূজার কাজ পড়িয়া গেছে, মাটির গোলা গুলিয়া ঘর নিকানোর কাজটাই প্রথমে আরম্ভ হইয়াছে, ওইটাই হইল মোটা কাজ এবং হাঙ্গামার কাজ। তাহার পর খড়ি ও গিরিমাটি দিয়া দুয়ারের মাথায় আলপনা দেওয়া আছে, খই মুড়ি ভাজা আছে, মুড়কি নাড়ুর ভিয়ান আছে। পূজার কাজের কি অন্ত আছে।

চাটুজ্জে-বাড়ির গিন্নী বলেন, মা ও মেয়ের হল দশ হাত, তারপর সঙ্গে আছে মেয়ে ছেলে সাঙ্গোপাঙ্গ, আমরা দু হাতে উদ্যুগ করে কি কুলিয়ে উঠতে পারি ?

আজ চাটুজ্জে-বাড়িতে প্রথম মাটির 'ছোঁচ' পড়িবে। চণ্ডীমণ্ডপে কারিগর আসিয়া গেছে, প্রতিমাতে আজ প্রথম মাটি পড়িবে।

বালতিতে করিয়া রাঙা মাটি গোলা হইয়াছে। বাড়ির বউ এবং ঝিউড়ি মেয়েরা গাছকোমর বাঁধিয়া হাতে সোনার অলঙ্কারের উপর ন্যাকড়া জড়াইয়া বসিয়া আছে, প্রতিমাতে মাটি পড়িলে হয়।

গিন্নী বলিলেন, ওরে, যা তো কেউ, দেখে আয় তো দেরি কত ? ছেলেগুলো সব গেল কোথায় ?

একটি মেয়ে বলিল, সব গিয়ে ঠাকুর-বাড়িতে বসে আছে।

সত্যই, সব ছেলে তখন চণ্ডীমণ্ডপে ভিড় জমাইয়া বসিয়া ছিল। বুড়া মিস্ত্রী কুমারীশ তখন লম্ফঝম্ফ করিয়া চৌকিদারের সঙ্গে বকাবকি করিতেছিল, বলি, তোর বিড়িগুলো আমাকে দিবি ? তোর কাজ আমি করব কেন শুনি ?

চৌকিদার কালাচাঁদ বলিল, ওই দেখ, আগ কর কেন গো ! উ মাটি আনতে গেলে কেউ দেয় নাকি ? বলে, গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে না ?

বলি, রাত্তিরে হাঁক দিতে বেরিয়ে লুকিয়ে খানিকটে আনতে পার নাই ? না, হাঁকই দাও না রাত্তিরে ?

ওই দেখ, কি বলে দেখ, হাঁক না দিলে হয় ? একবার করে তো বেরুতেই হয়। তা তুমি যে আজ আসবে, তা কি করে জানব বল ? ভুল হয়ে গেইছে।

চাটুজ্জে-গিন্নী বাহির দরজায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, অ কুমারীশ, বলি, হল তোমার ? মেয়েরা যে গোলা গুলে বসে আছে গো ! আর বকাবকি—

শীর্ণ খর্বাকৃতি মানুষ কুমারীশ, হাত-পাগুলি পুতুল-নাচের পুতুলের মত সরু এবং তেমনি দ্রুত ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে নড়ে। আর চলেও সে তেমনই খরগতিতে। কুমারীশ, গিন্নীমায়ের কথা শেষ হইবার পূর্বেই, তারস্বরে চীৎকার করিয়া আরম্ভ করিল, আর বলেন কেন মা, কালাচাঁদকে নিয়ে আমি আর কাজ করতে পারব না। কোনো উয্যুগ নাই, মাথা নাই, মুণ্ডু নাই, হাত নাই, পা নাই—আমি আর কি করব বলুন ?

বলিতে বলিতেই সে গিন্নীমায়ের নিকটে আসিয়া গড় হইয়া একটি প্রণাম করিয়া একেবারে প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে বলিল, তারপরে ভালো আছেন মা ? ছেলেপিলেরা সব ভালো ? বাবুরা সব ভালো আছেন ? দিদিরা, বউমারা সব ভালো আছেন ?

গিন্নীমা হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, সব ভালো আছে। তোমার বাড়ির সব ছেলেপিলে—

কথা কাড়িয়া বলা কুমারীশের অভ্যাস, সে আক্ষেপপূর্ণ কণ্ঠে আরম্ভ করিল, আর বলেন কেন মা, হাম, পেটের অসুখ, জ্বর—সব 'পইলট্ট' খেলছে মা। ডাক্তার-বদ্যিতে ফকির করে দিলে।

তারপর আবার অত্যন্ত প্রশান্তভাবে সে বলিল, শুনলাম, ছোটবাবু এসেছেন ফিরে—বড় আনন্দ হল। তা এইবার বউমাকে নিয়ে আসুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলেমানুষ, বুদ্ধির দোষে একটা—তা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

গিন্নীমা সমস্ত প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া বলিলেন, তোমার আর দেরি কিসের শুনি ? বউরা মেয়েরা গোলা দিয়ে চানই করবে বা কখন, খাবেই বা কখন ?

কুমারীশ বলিল, আর দেরি কি ! সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, কেবল এই বেণের আগনের মাটি লাগে কিনা, তাই—

সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর তাহার পঞ্চমে উঠিয়া গেল, তাই শুধুন কেন ওই বেটা বাউড়িকে যে, মাটি কই ? বাবু ভুলে গিয়েছেন। এ আমি কি করি বলুন দেখি, যাই, আমি আবার দেখে নিয়ে আসি। হুঁঃ, উয্যুগ নাই, আয়োজন নাই, আমারই হয়েছে এক মরণ ! বলিয়া সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে এবং অনুরূপ দ্রুতকণ্ঠে বকিতে বকিতে ওই মাটির সন্ধানে পথ ধরিল।—আমারই হয়েছে এক দায়, যাই, এখন কোথা পাই বেণের বাড়ি, দেখি ! হারামজাদা বাউড়ি বলে, গাল দেবে ! আরে, গাল দেবে কেন ? কই, আমাকে গাল দেয় না কেন ? যত সব-! দক্ষিণে তো সেই মামুলি বারো টাকা, বারো টাকায় কি মাথা কিনে নিয়েছে আমার ? পারব না, জবাব দিয়ে দেব। অঃ, খাতির কিসের রে বাপু ?

গণ্ডগ্রাম হইলেও পল্লীগ্রাম, এখানে শহর-বাজারের মতো প্রকাশ্যভাবে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কোনো রূপোপজীবিনী বাস করে না, তবে নীচ শ্রেণীর জাতির মধ্যে কলঙ্কিনীর অভাব নাই। গ্রামের পূর্ব-উত্তর কোণাংশে ডোমপল্লী, এই ডোমেদের পুরুষেরা করে চুরি, মেয়েরা করে দেহ লইয়া বেসাতি। মা-বাপ লইয়া সংসারের গৃহাচ্ছাদনের আবরণ দিয়া প্রকাশ্যেই তাহারা সব করিয়া থাকে। কুমারীশ এই ডোমপল্লীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, বলি কই গো সব, দিদিরা সব কই, গেলি কোথা গো সব ?

অদূরে একটা গাছতলায় চার-পাঁচটি মেয়ে জটলা করিয়া বসিয়া হি-হি করিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল। কুমারীশের কণ্ঠস্বরে, ধ্বনিতে সকলে চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

একজন বলিয়া উঠিল, ওলো, সেই পোড়ামুখো আইচে লো, সেই মিস্ত্রী, মাটি নিতে আইচে মুখপোড়া।—বলিতে বলিতে সে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলেও উচ্ছ্বসিত কৌতুকে হাসিয়া একটা মত্ত কলরোল তুলিয়া দিল।

এই যে, এই যে সব বসে রয়েছিস। তারপর সব ভালো আছিস তো দিদিরা ? রং নিয়ে আসিস, যাস সব, যাস। এবার ভাদু কেমন গড়ে দিয়েছিলাম, তা-বল ?

কুমারীশ এক মুঠা মাটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াই তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটা মেয়ে কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, মাটি নিতে আইচ বুঝি তুমি ? কেনে, কেনে তুমি লিবে, শুনি ?

লে লে, কেড়ে লে মুখপোড়ার হাত হতে। লে, কেড়ে লে।

কুমারীশ একরূপ ছুটিয়াই পথে নামিয়া অত্যন্ত খরবেগে চলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, প্রতিমে হবে দিদি, প্রতিমে হবে। যেও, যেও সব, রং দেব তুলি দেব, যেও সব। পদ্ম আঁকবে দোরে !

মেয়েরা আবার হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

একজন বলিল, ধর ধর, বুড়োকে ধর।

একজন বলিল, সবাইকে রং দিতে হবে কিন্তক।

কুমারীশ চলিতে চলিতেই ঘন ঘন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই রং দেবার সময়, সেই—

সে একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চাটুজ্জে-বাড়িতে মেয়েরা হুলুধ্বনি দিয়া গোলা দেওয়া আরম্ভ করিল। মেয়েদের মধ্যে সে এক আনন্দের খেলা। গোলা দেওয়ার নাম করিয়া এ উহাকে কাদা মাখাইবে, নিজেও ইচ্ছা করিয়া মাখিবে। বেলা দুই প্রহর, আড়াই প্রহর পর্যন্ত কাদা-মাখামাখি করিয়া ঘাটে গিয়া মাথা ঘষিয়া জল তোলপাড় করিয়া তবে ফিরিবে। সমস্ত বৎসরের মধ্যে তাহাদের এ একটা পরম প্রত্যাশিত উৎসব।

বাড়ির বড়মেয়ে একটা টুলের উপর দাঁড়াইয়া গোলার প্রথম ছাপটা দেওয়ালে টানিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে মেজমেয়ে বড়-ভ্রাতৃজায়ার গায়ে কাদা ছিটাইয়া দিয়া বলিল, তোমার মুখে গোলা দিয়ে নিকুতে হবে আগে—তুমি বাড়ির বড়বউ।

বড়বউ কিন্তু প্রতিশোধে মেজ-ননদের গায়ে কাদা দিল না, সে বড়-ননদের গায়ে গোলা দিয়া বলিল, তারপর ভাই বাড়ির বড়মেয়ে!

বড়মেয়ে হাতের কাদা-গোলা ন্যাকড়ার ন্যাতাটা থপ করিয়া মেজ-বউয়ের-মুখের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, তারপর আমাদের মেজগিন্নী।

মেজবউ টুলের উপর বড়-ননদের দিকে মুখ করিয়া মুখখানি বেশ উঁচু করিয়াই ছিল, ন্যাকড়ার ন্যাতাটা থপ করিয়া আসিয়া তাহার মুখের উপর সাটিয়া বসিয়া গেল। পরম কৌতুকে সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঠিক এই সময়েই একটি সুন্দরী তরুণী আসিয়া কাদা-গোলা লইয়া মেজ-ননদের গায়ে ছিটাইয়া দিয়া বলিল, তোমায় কেউ দেয় নি বুঝি?

মেয়েদের হাসি কলরোল থামিয়া গেল, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া সকলে যেন বিব্রত হইয়া উঠিল।

মেয়েটি বলিল, আমায় বুঝি ডাকতে নেই বড়দি! আমি বলে কত সাধ করে বসে আছি!

বড়বউ বলিল, ছোটবউ, তুমি ভাই মাকে জিজ্ঞেস করে কাদায় হাত দাও।

মাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, চাটুজ্জে-গিন্নী নিজেই আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ছোটবউকে সেখানে দেখিয়া বলিলেন, তুমি কাদায় হাত দিও না বউমা। অমূল্য দেখলে অনর্থ করবে মা, কেলেঙ্কারির আর বাকি রাখবে না। তুমি সরে এস।

ছোটবউয়ের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েদের কলরবের উচ্ছ্বাসে পূর্বেই ভাঁটা পড়িয়াছিল, তাহারা এবার কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বড়মেয়ে অত্যন্ত বিরক্তিভরে বলিল, সেই থেকে একটা ন্যাতা দেওয়ালে উঠল না! নে নে, ন্যাতা দে না, অ বড় বউ!

ঠিক এই সময়েই কুমারীশ চিৎকার করিতে করিতে আসিয়া বলিল, টুল নাই, মোড়া নাই, আমি কি তালগাছে চড়ে মাটি দেব ? কই, গিন্নীমা কই ? একটা টুল চাই যে মা, একটা টুল না হলে—আমি তো এই দেড়হাত মানুষ !

বাড়ির চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া গিন্নীমা বলিলেন, আর একটা টুল আবার গেল কোথা ? তুমি জান বড়বউমা ?

কুমারীশ বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ছোটবউয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এ বউটি কে গিন্নীমা ?

গিন্নীমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ছোটবউমা, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ মা ! ছি, বার বার বলে তোমাকে পারলাম না ! যাও, ওপরে যাও।

ছোটবউ ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কুমারীশ বলিল, ইনিই আমাদের ছোটবউমা ? আহা-হা, এ যে সাক্ষাৎ দুগগা-ঠাকরুন গো, অ্যাঁ, এমন চেহারা তো আমি দেখি নাই ! আহা-হা ! অ্যাঁ, এমন লক্ষ্মী ঘরে থাকতে, ছোটবাবু আমাদের অ্যাঁ—ছি ছি ছি !

গিন্নীমা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কুমারীশ, তুমি এসেছ প্রতিমে গড়তে, তোমার ওসব কথায় কাজ কি বাপু ? অ বড়বউমা, টুল আর একটা গেল কোথায় ?

কুমারীশ বার বার ঘাড় নাড়িয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, তা বটে ; আপনি ঠিক বলেছেন। হ্যাঁ, তা বটে, আমাদের ও কথায় কাজ কি ? হ্যাঁ, তা বটে, তা আপনি ভাববেন না—সব ঠিক হয়ে যাবে। আহা-হা, এমন মুখ তো আমি—

বাধা দিয়া গিন্নীমা বলিলেন, তুমিও যাও কুমারীশ, আমি টুল পাঠিয়ে দিচ্ছি। দাঁড়িয়ে গল্প কোরো না, যাও, আপনার কাজ কর গে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে—আমার বলে কত কাজ পড়ে আছে ! সাতাশখানা প্রতিমে নিয়েছি। আমার বলে মরবার অবসর নাই !

কুমারীশ যে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছিল, আহা, এ যে সাক্ষাৎ দুগগা-ঠাকরুন গো ! —সে কথাটা অতিরঞ্জন নয়। তবে উচ্ছ্বাসটা হয়তো অশোভন হইয়াছিল। চাটুজ্জে বাড়ির ছোটবধূটি সত্যই অতি সুন্দরী মেয়ে। সকলের চেয়ে সুন্দর তাহার মুখশ্রী। বড় বড় চোখ, বাঁশির মতো নাক, নিটোল দুইটি গাল, ছোট্ট কপালখানি। কিন্তু চিবুকের গঠন-ভঙ্গিটিই সর্বোত্তম, ওই চিবুকটিই মুখখানিকে অপরূপ শোভন করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু এত রূপের অন্তরালে লুকানো ছিল মেয়েটির দগ্ধ ললাট। তাহার এমন শুভ্র স্বচ্ছ রূপের অন্তরালে নির্মল জলতলের পঙ্কস্তরের মতো সে ললাট যেন চোখে দেখা যাইত।

পাঁচ বৎসর পূর্বে, ছোটবধূ যমুনার বয়স তখন বারো, সে তখন সবে বাল্যজীবনের অনাবৃত সবুজ খেলার মাঠ হইতে কৈশোরের কুঞ্জবনে প্রবেশ করিয়াছে, তখনই তাহার এ বাড়ির ছোটছেলে অমূল্যের সহিত বিবাহ হয়। অমূল্যের বয়স তখন চব্বিশ। বাড়ির অবস্থা স্বচ্ছল, খানিকটা জমিদারি আছে, তাহার উপর মায়ের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, সুতরাং স্বেচ্ছাচারী হইবার পক্ষে কোনো বাধা ছিল না। সকাল হইতে সে কুস্তি, মুগুর, লাঠি লইয়া কাটাইয়া খান দশেক রুটি অথবা পরোটা খাইয়া বাহির হইত স্নানে। পথে সাহাদের দোকানে খানিকটা খাঁটি গিলিয়া স্নানান্তে বাড়ি ফিরিত বেলা দুইটায়। তারপর আহার ও নিদ্রা। সন্ধ্যায় আবার বাহির হইয়া ফিরিত বারোটায় অথবা আরও খানিকটা পরে, তখন সে আর বাড়ির দুয়ার খুঁজিয়া পাইত না। মা তাহার জাগিয়া বসিয়া থাকিতেন। গ্রামেও তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিল না, আজ ইহাকে প্রহার, কাল তাহার মাথা ফাটাইয়া দেওয়া, কোনোদিন বা কাহারও গৃহে অনধিকার-প্রবেশ প্রভৃতি নানা ধরনের বহু অভিযোগ। এই সময়েই প্রথম পক্ষ বিয়োগের পর খুঁজিয়া পাতিয়া এই সুন্দরী যমুনার সহিত তাহার বিবাহ হইল। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই সে যমুনাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। কয়দিন পরই গেল গঙ্গাস্নান করিতে। সেখানে এক যাত্রিনীর উপর পাশবিক অত্যাচার করার জন্য অত্যাচারীকে হত্যা করার অপরাধে তাহার কয় বৎসর জেল হইয়া যায়। তারপর এই মাসখানেক পূর্বে অমূল্য বাড়ি ফিরিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যমুনাকেও আনা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্বে সেদিন এজন্য চাটুজ্জে-বাড়ির মাথাটা লজ্জায় মাটিতে নত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সে লজ্জা বেশ সহিয়া গিয়াছে; মাটিতে যে মাথা ঠেকিয়াছিল, সে মাথা আবার ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। এখন অমূল্যকে লইয়া শুধু অশান্তি আর আশঙ্কা। অশান্তি সহ্য হয়, কিন্তু আশঙ্কার উদ্বেগ অসহনীয়, পাছে সে আবার কিছু করিয়া বসে, এই আশঙ্কাতেই সকলে সারা হইয়া গেল। সকলে আশঙ্কা করিয়াই খালাস, কিন্তু সে আশঙ্কা নিবারণের দায়িত্ব ঐ বধূটির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাই বধূটির প্রতি সতর্কবাণীর অন্ত নাই, অহরহ তাহাকে সকলে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যমুনা ভয়ে ঠকঠক করিয়া কাঁপে।

কুমারীশ রাত্রেও প্রতিমার গায়ে মাটি ধরাইতেছিল, তাহার ভাইপো যোগেশ হ্যারিকেনের লণ্ঠনটি উঁচু করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কুমারীশ প্রতিমার গায়ে মাটি দিতে দিতেও ভাবিতেছিল ওই বধূটির কথা। মেয়েটিকে তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে। আহা, এমন সুন্দর মেয়ে, আর তাহার স্বামী কিনা এমন! সে এ বাড়িতে বহু দিন প্রতিমা গড়িতেছে, ওই ছোটবাবুকে সে ছোট ছেলেটি দেখিয়াছে। এইখানেই সে এমনই করিয়া প্রতিমাতে মাটি দিত, আর ছোট ছেলেটি বলিত, দেবে না মিস্ত্রী, দেবে না।

সে বলিত, দেব গো, দেব।

কবে দেবে?

কাল।

না আজই দাও, ও মিস্ত্রী!

হ্যাঁ বাবু, এই ঠাকুরই তো তোমার, আবার কাত্তিক দিয়ে কি হবে?

না, আমায় কাত্তিক গড়ে দাও।

সে হাসিয়া বলিত, বাবু আমাদের খ্যাপা বাবু।

সেই ছেলে এমন হইয়া গেল! গেল গেল, কিন্তু এমন সুন্দর মেয়ে—! মিস্ত্রীর চোখের সম্মুখে প্রতিমার মতো মুখখানি যেন জলজ্বল করিতেছে। সে স্থির করি ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা হইলে হয়, সে তাহাকে বেশ করিয়া বলিবে।

যোগেশ বলিল, কাকা, রাত হল অনেক, আজ আর থাকুক।

কুমারীশ অত্যন্ত চটিয়া উঠিল, থাকুক! কালও একবেলা এইখানেই কাটুক, না কি? প্রতিমে যে সাতাশখান, তা মনে আছে?

যোগেশ ক্লান্তভাবে বলিল, তা হোক কেন। ওই দেখ, চৌকিদার হাঁক দিচ্ছে।

হাতের কাদার তালটা থপ করিয়া ফেলিয়া দিয়া কুমারীশ বলিল, ওই নে, ওই নে। মরগা যেয়ে তোরা, দেখে নিগে, বুঝে নিগে সব, আমি আর কিছু পারব না।

সে উঠিয়া আসিয়া বালতির জলে হাত ডুবাইয়া খলখল করিয়া ধুইতে আরম্ভ করিল।

অপ অপ, অ্যাও, অপ!

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শব্দ উঠিতেছিল, দৃপ্ত এবং উচ্চ কণ্ঠে শাসন বাক্য ধ্বনিত হইতেছে। কুমারীশ অকস্মাৎ অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল, বলিল, তাই তো রে, চৌকিদারই বটে! উঃ, খুব বলেছিস বাবা! রাত অনেক হয়েছে রে! হুঁ, রাত একেবারে সনসন করছে! নে, একবার তামুক সাজ দেখি।

যোগেশ তামাক সাজিতে বসিল।

অপ অপ, কোন হ্যায়? অ্যাও উল্লুক!

কুমারীশ চমকিয়া উঠিল। লণ্ঠনের আলোকে সভয়ে দেখিল, অসুরের মতো দৃঢ় শক্তিশালী এক জোয়ান সম্মুখে দাঁড়াইয়া। চোখ দুইটা অস্থির, পা টলিতেছে, হাতের শক্ত বাঁশের লাঠিগাছাটা মাটিতে ঠুকিয়া সে প্রশ্ন করিতেছে, অ্যাও, উল্লুক!

মুহূর্তে সে চিনিল, চাটুজ্জে-বাড়ির ছোটবাবু। কিন্তু তাহার সে মূর্তি দেখিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে অতি ভক্তিভয়ে প্রণাম করিয়া বলিল, ছোটবাবু, পেনাম, ভালো আছেন?

লণ্ঠন, প্রতিমা, মাটি এবং কুমারীশকে একসঙ্গে দেখিয়া ছোটবাবুর মনে পড়িল। সে বলিল, মিস্তিরী, তুমি মিস্তিরী ?

কৃতার্থ হইয়া কুমারীশ বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, কুমারীশ মিস্ত্রী।

লণ্ঠনের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বেশ করিয়া কুমারীশকে দেখিয়া বলিল, এ প্লাই ফক্স মেট এ হেন।—প্লাই ফক্স মানে খ্যাঁকশেয়ালি। মাটি দিচ্ছ, বেশ, মা জগদম্বা, মাগো মা!

মিস্ত্রী তাহাকে খুশি করিবার জন্যই আবার বলিল, শরীর ভালো আছে ছোটবাবু ?

শরীর, নশ্বর শরীর। আইয়ন মেন—লোহার শরীর। দেখ, দেখ!—বলিয়া সে এবার তাহার ব্যায়ামপুষ্ট দৃঢ়পেশী একখানা হাত বাহির করিয়া মুঠি বাঁধিয়া আরও শক্ত করিয়া মিস্ত্রীর সম্মুখে ধরিল।

দেখ, টিপে দেখ।—অপ!

মিস্ত্রী সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। অমূল্য নিজের হাতের লাঠিটা প্রসারিত হাত-খানায় আঘাত করিয়া বলিল, টমটম চালা দেগা—টমটম। এই পেতে দিলাম হাত, চালিয়ে দাও টমটম।

কুমারীশ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ওদিকে পুকুরটার পাড়ে বাঁশবনে বাতাসের বেগে বাঁশগুলি দুলিয়া পরস্পরের সহিত ঘর্ষণ করিয়া শব্দ তুলিতেছিল, ক্যাঁক্যাঁ—ক্যাঁটক্যাঁট। নানা-প্রকার শব্দ।

অমূল্য লাফ দিয়া হাঁকিয়া উঠিল, অপ! কোন হ্যায়! অ্যাও!

বাঁশবনের শব্দ থামিল না, বায়ুপ্রবাহ তখনও সমানভাবে বহিতেছিল। অমূল্য হাতের লাঠিগাছটা আস্ফালন করিয়া বলিল, ভূত।

মিস্ত্রী বলিল, আজ্ঞে না, বাঁশ।

আলবত ভূত, কিংবা ছেনাল লোক ইশারা করছে।

তারপর অত্যন্ত আস্তে সে বলিল, সব খারাপ হয়ে গিয়েছে। সব চরিত্র খারাপ। ওই শালা যদো শালা বাঁশি বাজায়, শালা কেষ্টো হবে! শালা, মারে ডাঙ্গা!

বাতাসের প্রবাহটা প্রবলতর হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের শব্দও বিচিত্রতর এবং উচ্চতর হইয়া বাজিতে আরম্ভ করিল। অমূল্য ক্ষিপ্ত হইয়া লাঠিখানা লইয়া সেই দিকে চলিল, অপ অপ অপ, আমাকে ভয় দেখাও শালা? শালা ভূত, আও আও, চলা আও—অপ।

মিস্ত্রী অবাক হইয়া অমূল্যকেই দেখিতেছিল। সহসা সে এক সময় উর্ধ্বলোকে, বোধ করি, দেবতার উদ্দেশ্যেই দৃষ্টি তুলিতে গিয়া দেখিল, শূন্যলোকের অন্ধকারের মধ্যে

আলোকের দীর্ঘ ধারা ভাসিতেছে। সে দেখিল, সম্মুখেই চাটুজ্জে-বাড়ির কোঠার জানালায় আলো জ্বালিয়া জানালার শিক ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছোটবধূটি। আলোকচ্ছটায় তাহাকে যে কেহ দেখিতে পাইবে, সে খেয়াল বোধ করি তাহার নাই। সে উপরে আলোক-শিখা জ্বালিয়া নীচে অমূল্যের সন্ধান করিতেছে। কুমারীশ বিষণ্ণ অথচ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বধূটির দিকে চাহিয়া রহিল।

বাঁশের বনে তখন অমূল্য যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অপ অপ—আও আও আও—অপ!—বলিয়া হাঁক মারিতে মারিতে ঠকাঠক শব্দে বাঁশের উপর লাঠি দিয়া আঘাত আরম্ভ করিল।

যোগেশ আসিয়া কুমারীশের হাতে হুঁকাটি দিয়া বলিল, চল, টানতে টানতেই চল বাপু। যে মশা, বাবা, এ যেন চাক ভেঙেছে! গা হাত পা ফুলে উঠল।

কুমারীশ চকিত হইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ওগো বউমা, গিন্নীমাকে ডেকে দাও বরং, ও কি!

অত্যন্ত ক্ষিপ্রবেগে আলোটা সরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে জানালাটাও বন্ধ হইয়া গেল।

কুমারীশ বলিল ওগো, ও ছোটবাবু, ও ছোটবাবু!

ছোটবাবুর কানে সে কথার শব্দ প্রবেশই করিল না, সে তখনও সমানে বাঁশবনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

যমুনার জীবন নিজের কাছে যে কতখানি অসহনীয়—সে যমুনাই জানে, কিন্তু তাহার বহিঃপ্রকাশ দেখিয়া কিছু বোঝা যায় না। শরতের চঞ্চল চাঁদের মতো তখনই তাহার মুখ মেঘে ঢাকিয়া যায়, আবার তখনই সে উজ্জ্বল চাঞ্চল্যে হাসিয়া উঠে।

কিন্তু কুমারীশ মিস্ত্রীর তাহার জন্য বেদনার সীমা রহিল না। সে মনে মনে 'হায় হায়' করিয়া সারা হইল। দিন বিশেক পরে প্রতিমাতে 'দ্রুমৃত্তিকা' অর্থাৎ তুষ-মাটির উপরে কালো মাটি ও ন্যাকড়ার প্রলেপ লাগাইয়া, মুখ বসাইয়া, হাতে পায়ে আঙুল জুড়িয়া মাটির কাজ সারিবার জন্য কুমারীশ আসিয়া হাজির হইল। চাটুজ্জে-বাড়িতে তখন পূজার কাজ লইয়া ব্যস্ততার আর সীমা ছিল না। মুড়ি ভাজার কাজ তখন আরম্ভ হইয়া গেছে। পূজার কয়দিনের খরচ আছে, তাহার উপর বিজয়া-দশমী ও একদশীর দিনের খরচ একটা প্রকাণ্ড খরচ;—অন্তত পাঁচ শত লোক আসিয়া আঁচল পাতিয়া দাঁড়াইবে। বড়বউ, বড় মেয়ে, মেজবউ প্রকাণ্ড বড় বড় ধামায় মুড়ি ভরিয়া ঘরের মধ্যে তুলিতেছে। মেজমেয়ে ভাঁড়ারের হাঁড়িগুলি বাহির করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া আবার তুলিয়া রাখিতেছে, নূতন মসলাপাতি ভাণ্ডারজাত হইবে। ছোটবধূটিকে

পর্যন্ত কাজে লাগানো হইয়াছে, সে বারান্দার এক কোণে বসিয়া সুপারি কাটিতেছে।

কুমারীশ প্রতিমার গায়ে লাগাইবার জন্য পুরানো কাপড়ের জন্য আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া কলরব করিতে আরম্ভ করিল, কই, গিন্নীমা গেলেন কোথায়? এ কি বিপদ দেখ দেখি! গিন্নীমা গেলেন কোথা গো? ও গিন্নীমা!

মুড়ির ধামাটা কাঁধে করিয়া যাইতে যাইতে বড়বউ বলিল, না বাপু, মিস্ত্রী দেখছি বাড়ি মাথায় করলে! তোমার কি আস্তে কথা হয় না নাকি?

বড়মেয়ে বলিল, মিস্ত্রী আমাদের পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসে কিনা, ঘোড়া দাঁড়ায় না।

কুমারীশ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, দিদি-ঠাকরুন বলেছেন বেশ। ওটা আমার অভ্যেস। আমার শাশুড়ী কী বলত জানেন? বলত, কুমারীশকে নিয়ে পরামর্শ করা বিপদ, পরামর্শ করবে তো লোকে মনে করবে, কুমারীশ আমার ঝগড়া করছে।

বড়বউ অল্প হাসিয়া বলিল, তা যেন হল। এখন কী চাই বল দেখি তোমার?

পাচিকা পাঁচুদাসী বলিল, চেঁচিয়ে গাঁ মাথায় করে কুমারীশ।

কুমারীশ অত্যন্ত চটিয়া গেল। তোমার, ঠাকরুন বড় ট্যাকটেকে কথা! না চেঁচালে এ বাড়িতে জিনিস পাওয়া যায়? পুরানো কাপড় চাই, তা ঠাকরুনরা জানে না নাকি? আমার তো বাপু, এক জায়গায় বসে হাঁড়ি ঠেলা নয়! সাতাশখানা—

বাধা দিয়া বড়বউ বলিল, সব ঠিক করে রেখেছি বাবা, গোছানো পাট করা সব ঠিক হয়ে আছে।

তারপর চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, কাকেই বা বলি! ও ছোটবউ, দাও তো ভাই, ওই কাঠের সিন্দুকের ওপর ভাঁজ করা আছে এক পুঁটলি কাপড়।

কুমারীশ তাড়াতাড়ি বড়বধূর নিকট আসিয়া চুপি চুপি কহিল, বড়বউমা, আমাদের ছোটবাবু এখনও তেমনই রাত করে আসে?

বড়বধূ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিতেই অর্ধপথে সে নীরব হইয়া গেল।

বড়বধূ বলিল, কেন বল তো?

এই—না, বলি, ঘরথাই হল নাকি, মানে, ছোটবউমা আমাদের সোনার পুতুল। আহা মা, চোখে জল আসে আমার।

বড়বউ চুপিচুপিই বলিল, আমাকে যা বললে বেশ করলে, কিন্তু ও কথা আর কাউকে শুধিও না মিস্ত্রী। মা শুনলে রাগ করবেন, ছোটবাবু শুনলে তো রক্ষে থাকবে না।—বলিয়াই সে খালি ধামাটা সেইখানেই নামাইয়া নিজেই কাপড় আনিতে অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে ছোটবউই কাপড়ের পুঁটলিটা বাহির করিয়া আনিয়া

দাঁড়াইল। বড়বউ তাহার হাত হইতে পুঁটলিটা লইয়া কুমারীশের হাতে দিয়া বলিল, আর যদি লাগে তো মার কাছে এসে চাইবে, আমরা আর দিতে-টিতে পারব না।

ছোটবউ মৃদুস্বরে বলিল, আমাকে মেজদিদির মতো একটা হাতি গড়ে দিতে বল না দিদি!

কুমারীশ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে তো আমি দিয়েছি মেজদিদিমণিকে। দেব, দেব, দুটো হাতি গড়ে এনে দেব। হাতির ওপর মাহুত সুদ্ধ।

.বড়বউ বলিল, ছোটবউ, তুমি ঘরের ভেতর যাও। কুমারীশ, যাও বাবা, কাপড় তো পেলে, এইবার যাও।

কুমারীশ কাপড়ের পুঁটলিটা বগলে করিয়া বাহির হইয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপে তখন ছেলের দল এমন ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে যে, যোগেশ এবং আর একজন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। কে একজন মহিষের মুণ্ডটা তুলিয়া লইয়া পলাইয়াছে। কুমারীশ পিছন হইতে বলিল, মাটি করলে রে বাবা, মাটি করলে! কই কই, বিষকাদা কই, দে দে, সব লাগিয়ে দে। ধর ধর, যোগেশ, ধর সব।

বিষকাদাকে ছেলেদের বড় ভয়, বিষকাদা গায়ে লাগিলে নাকি ঘা হয়। আর যে বিশ্রী গন্ধ! ছেলের দল ছুটিয়া সরিয়া গেল। কুমারীশ একটা মোটা তুলিতে গোবর ও মাটির তরল গোলা ছিটাইতে ছিটাইতে বলিল, পালা সব, পালা এখন। সেই হয়ে গেলে আসবি সব।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আবার একটি দুইটি করিয়া জমিতে আরম্ভ করিল।

কুমারীশ একজনকে বলিল, কই, তামুক আন দেখি খানিক।

রাত্রে জানালার উপর আলোটি রাখিয়া যমুনা একা বসিয়া ছিল। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। পূজার কাজে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যে যাহার ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একা ঘরে যমুনার শুইতে বড় ভয় করে। অমূল্য মদ খাইয়া ভীষণ মূর্তিতে আসিলেও সে আশ্বস্ত হয়, মানুষের সাহস পাইয়া শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়ে। অমূল্যের অত্যাচার প্রায় তাহার সহিয়া আসিয়াছে। অমূল্যের প্রহারের চেয়ে আদরকে তাহার প্রথম প্রথম বেশি ভয় হইত, সেও তাহার সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু রাত্রির প্রথম দিকের এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাহার ভয়ের আর অন্ত থাকে না। কেবল মনে হয়, যদি ভূত আসে! ঘরের দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া প্রাণপণে চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া থাকে, ঘরের মধ্যে আলোটা দপদপ করিয়া জ্বালিয়া দেয়।

আজ চণ্ডীমণ্ডপে মিস্ত্রীরা প্রতিমা গড়িতেছে, খানিকটা দূরেও জাগ্রত মানুষের আশ্বাসে সে জানালা খুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। লাগিতেছেও

বেশ। উহারা গুজগুজ করিয়া কথা কহিতেছে, কাজ করিতেছে, একজন ছোট মিস্ত্রী কাঠের পিঁড়ার উপর মাটির নেচি দ্রুত পাক দিয়া লম্বা লম্বা আঙুলগুলি গড়িতেছে, একজন ছাঁচে ফেলিয়া মাটির গয়না গড়িতেছে আর কুমারীশ প্রতিমার মুখগুলি গড়িতেছে। বাঁশের পাতলা টুকরা দিয়া নিপুণ ক্ষিপ্রতার সহিত ভ্রূ চোখ মাটির তালের উপর ফুটাইয়া তুলিতেছে। ইহার পর মুখের উপর গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া মাজিবে। যমুনা ছেলেবেলায় কত দেখিয়াছে। সিমেণ্ট-করা মেঝের মতো পালিশ হইবে।

বউমা, জেগে রয়েছেন মা!

যমুনা চকিত হইয়া উঠিল, মাথার ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া সে একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। নিজেই একটু জিভ কাটিল, মিস্ত্রী দেখিয়া ফেলিয়াছে!

আমি খুব ভালো হাতি গড়ে এনে দেব এক জোড়া। দুটো মাটির বেরাকেটও এনে দেব। তারই ওপর রেখে দেবেন।

যমুনা সসঙ্কোচে আবার আসিয়া জানলায় দাঁড়াইল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলিল, ব্র্যাকেট দুটোর নীচে দুটো পরী গড়ে দিও। যেন তারাই মাথায় করে ধরে আছে।

কুমারীশ বলিল, না, দুটো পাখি করে দেব? পাখি উড়ছে, তারই পাখার ওপর বেরাকেট থাকবে।

যমুনা ভাবিতে বসিল, কোনটা ভালো হইবে।

কুমারীশও নীরবে কাজ করিতে আরম্ভ করিল, কয়েক মিনিট পরেই আবার সে বলিল, আর দুটো ঘোড়াও গড়ে এনে দেব বউমা।

যমুনা পুলকিত হইয়া বলিল, না, তার চেয়ে বরং দুটো চিংড়ি মাছ গড়ে দিও।

এবার সে ঘোমটাটা সরাইয়া ফেলিল। যে গরম!

চিংড়ি-মাছ? আচ্ছা, ঘোড়াও আনব, চিংড়ি-মাছও আনব। কিন্তু শিরোপা দিতে হবে মা।

যমুনার মুখ ম্লান হইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, তুমি দুটো হাতিই এনে দিও শুধু।

কেন মা, শিরোপার কথা শুনে ভয় পেলে নাকি? সব এনে দেব মা, একখানি তোমার পুরোনো কাপড় দিও শুধু। আর কিছু লাগবে না।

অন্ধকার নিশুতি রাত্রে ধীরে ধীরে ভীত তরুণী বধূটির সহিত মিস্ত্রীর এক সহৃদয় আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিতেছিল—ওই দেবীপ্রতিমাটির মতোই।

অপ অপ, চলে আও, বাপকো বেটা হোয় তো চলে আও!

অমূল্য আসিতেছে। ভীত হইয়া মিস্ত্রী উপরের দিকে চাহিয়া বধূটিকে সাবধান

করিতে গিয়া দেখিল, অত্যন্ত সন্তর্পণে জানালাটি বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সে আপন মনে কাজ করিতে বসিল।

অ্যাই মিস্ত্রী!

ছোটবাবু, পেনাম!

ওই শালা রমনা, শালা পেসিডেনবাবু হইছে শালা! শালা, মারব এক ঘুঁষি, শালা ট্যাক্সো লিবে। শালা ফিষ্টি করে খাচ্ছে পাঁঠা মাছ পোলাও, শালা! হাম দেখ লেঙ্গে!

কুমারীশ চুপ করিয়া রহিল।

আজ সটান বাড়ির দরজায় গিয়া অমূল্য বন্ধ দ্বারে লাথি মারিয়া ডাকিল, অ্যাও, কোন হ্যায়? খোল কেয়াড়ি!

কিছুক্ষণ পরই যমুনার অবরুদ্ধ ক্রন্দনধ্বনি শোনা যায়। অমূল্য মারে এবং শাসন করে, চোপ, চোপ বলছি চোপ!

পূজার দিন চারেক পূর্বে কুমারীশ আবার আসিয়া প্রতিমায় রং লাগাইয়া দিয়া গেল। যমুনার আনন্দের আর সীমা রহিল না; কুমারীশ একটা প্রকাণ্ড ডালায় করিয়া ব্রাকেট, হাতি, ঘোড়া, চিংড়ি-মাছ, এক জোড়া টিয়াপাখি পর্যন্ত আনিয়া তাহাকে দিয়া গিয়াছে।

মা কিন্তু মুখ ভার করিয়া বলিলেন, অমূল্যকে না বলে এই সব কেন বাপু? তা এখন দাম কি নেবে বল?

কুমারীশ পুলকিত হইয়া বলিল, দাম? এর আবার দাম লাগে নাকি মা? দেখুন দেখি! আমারও তো বউমা উনি।

বড় মেয়ে হাসিয়া বলিল, সুন্দর মানুষকেই সবাই সব দেয়, আমরা কালো মানুষ—

কুমারীশ প্রচণ্ড কলরব করিয়া উঠিল, আপনাকেও এনে দেব দিদিমণি। দেখুন দেখি, দেখুন দেখি, আপনি হলেন বড়দিদি!

সে দ্রুতপথে পলাইয়া গেল।

মা আবার বলিলেন, অমূল্যকে বোলো না যেন বউমা। যে মানুষ!

রাত্রে সেদিনও যমুনা জানালায় বসিয়া মিস্ত্রীকে বলিল, ভারি সুন্দর হয়েছে মিস্ত্রী! ভারি সুন্দর!

উচ্ছ্বসিত কুমারীশ বলিল, পছন্দ হয়েছে মা?

যমুনা পুলকিত মুখে আবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুব পছন্দ হয়েছে। হাতি দুটো মেজদির চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।

তুমি একটু বোসো মা, আমি চক্ষুদানটা করে আসি। লক্ষ্মীর হয়েছে, সরস্বতীর হয়েছে, এইবার ঠাকরুনের চোখ, মা।

যমুনা ওই স্থানটির দিকেই চাহিয়া বসিয়া রহিল।

অ্যাও, কোন হ্যায়? চুরি—চুরি করেগা? ছেনালি করেগা? শালা, মারে গা ডাণ্ডা! অপ অপ!

কোনো কল্পিত ব্যক্তিকে শাসন করিতে করিতে আজ একটু সকালেই অমূল্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

মা নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু যমুনা তাহাকে খেলনাগুলি না দেখাইয়া পারিল না। তাহার অন্তর ছিল পুলকিত, তাহার উপর আজ অমূল্য আসিয়া তাহাকে আদর করিয়া বুকে টানিয়া লইল। যমুনা উচ্ছ্বসিত আনন্দে ডালার কাপড়খানা খুলিয়া তাহাকে পুতুলগুলি দেখাইয়া বলিল, কেমন বল দেখি? খুব সুন্দর নয়?

চিংড়ি-মাছটা তুলিয়া ধরিয়া অমূল্য বলিল, গলদা হ্যায়, মারে গা কামড়?

যমুনা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘোড়াটা দেখিয়া অমূল্য বলিল, কেয়াবাত রে পক্ষীরাজ—চিঁ হিহি!

যমুনা বলিল, মিস্ত্রী আমাকে এনে দিয়েছে।

মিস্তিরী—স্লাই ফক্স—ওই খ্যাঁকশেয়ালি? অ্যাই মিস্তিরী!—সঙ্গে সঙ্গে সে জানালাটা খুলিয়া বলিল, গুড ম্যান, দি স্লাই ফক্স ইজ এ গুড ম্যান, আচ্ছা আদমী।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া যমুনাকে কাছে টানিয়া লইল।

* * *

লজ্জায় আক্ষেপে আশঙ্কায় মায়ের অবস্থাটা হইল অবর্ণনীয়। দারুণ লজ্জায় চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত প্রতিবেশীদের সম্মুখে আর মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। কোনোরূপে দেবকার্য শেষ করিয়া পলাইয়া আসিয়া বাঁচিলেন, কিন্তু বাড়িতেও তখন মৃদু গুঞ্জনে ঐ আলোচনাই চলিতেছিল। বড়মেয়ে গালে হাত দিয়া ফিসফিস করিয়া বলিতেছিল, বড়বউ দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিল।

মা জোড়হাত করিয়া বলিলেন, তোমাদের পায়ে পড়ি মা, ওকথা আর ঘেঁটো না। ছি ছি ছি রে আমার কপাল!

বড়বউ বলিল, আমরা চুপ করলে আর কি হবে মা, পাড়াপড়শী তো গা টেপাটিপি করছে!

বড়মেয়ে বলিল, মেয়েমানুষের যার একটুকুন রূপ থাকে তাকে একটুকুন সাবধানে থাকতেও হয়, বাড়ির গিন্নীকেও সাবধানে রাখতে হয়। রামায়ণ পড়, মহাভারত পড়—

বাধা দিয়া মা বলিলেন, দোহাই মা, চুপ কর. তোমাদের পায়ে ধরছি। অমূল্য শুনলে আর রক্ষে থাকবে না।

ছোটবধূটি তখন উপরে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে আয়নাখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভয়ে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। মিথ্যা তো নয়, দেবী-প্রতিমার মুখে যে তাহারই মুখের প্রতিবিম্ব!

মেয়ে-মহলে সেই কথারই আলোচনা চলিতেছে। প্রতিচ্ছবি এত সুস্পষ্ট যে, কাহারও চোখ এড়ায় নাই।

দেবতার কাছে অপরাধ, মানুষের কাছে অপরাধ, অপরাধের বোঝা যমুনার মাথায় পাহাড়ের মতো চাপিয়া বসিয়াছে। তাহার উপর তাহার স্বামী! ভয়ে সে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু যমুনার ভাগ্য ভালো যে, অমূল্য পূজার কয়দিন বাড়িমুখোই হইল না। গ্রামে পূজা-বাড়িগুলির বলিদানের খবরাদি করিতেই তাহার কাটিয়া গেল। হাড়িকাঠে পাঁঠা লাগাইলে সে ঘাড়টা সোজা করিয়া দেয়, খানিকটা ঘি ডলিয়া একটা থাপ্পড় মারিয়া বলে, লাগাও—অপ!

বলিদান হইলে ঢাকী ও ঢুলীদের মধ্যে লাঠি লইয়া পাঁয়তাড়া নাচ নাচে। রাত্রে কোনোদিন লোকজনে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া লইয়া আসে, কোনো দিন কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার ঠিকানা কেহ জানিতে পারে না।

বিজয়া-দশমীর দিন কিন্তু কথাটা তাহার কানে উঠিল। কানে উঠিল নয়, সে সেদিন স্বচক্ষেই দেখিল। গ্রামেও সেদিন এই আলোচনাটা ওই ঢাক-ঢোলের বাদ্যের মতোই প্রবল হইয়া উঠিল।

চাটুজ্জে-বাড়ির বাউড়ী ঝি মাঝপথ হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মা, দাদাবাবু আজ খেপে গেইছে! লাঠি নিয়ে সে যা করছে আর বলছে, 'আমার বউয়ের মতো অ্যা—,' আর 'অপ অপ' করছে।

বাড়িসুদ্ধ শিহরিয়া উঠিলেন। সমস্ত বাড়িতে যেন একটা আতঙ্কের ছায়া নামিয়া আসিল। অমূল্যের এই কয়েকদিন অনুপস্থিতিতে ও চৈতন্যজ্ঞানহীনতার অবকাশে যমুনা খানিকটা সুস্থ হইয়াছিল, কিন্তু আজ আবার সেই আতঙ্কের আকস্মিক আগমন সম্ভাবনায় সে দিশাহারার মতো খুঁজিতেছিল—পরিত্রাণের পথ। তাহার উপর সমস্ত গ্রামটা নাকি তাহার কথা লইয়া মুখর। এ লজ্জা সে রাখিবে কোথায়? আপনার ঘরে সে লুকাইয়া গিয়া বসিল দুইটা বাক্সের আড়ালের মধ্যে। নীচে বাড়ির মধ্যে ওই আলোচনাই চলিতেছে। পাশের বাড়িতেও ওই কথা। খোলা জানালাটা দিয়া যমুনা স্পষ্ট শুনিতে পাইল, ছি ছি ছি!

কিছুক্ষণ পরেই অমূল্য ফিরিল নাচিতে নাচিতে। অপ অপ! মা কই, মা, পেনাম করি, আচ্ছা বউ করেছ মা, ফাস্ট. চাকলার মধ্যে ফাস্ট! দুগগা-মায়ের মুখ ঠিক বউয়ের মতো মা! দুগগা-প্রতিমে! অ্যাই ছোটবউ, অ্যাই! কই ছোটবউ!

কিন্তু কোথায় ছোটবউ? সমস্ত বাড়ির মধ্যে ছোটবউয়ের সন্ধান মিলিল না। সমস্ত রাত্রি অমূল্য পাগলের মতো চীৎকার করিয়া ফিরিল।

পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে পূজার খরচের জন্য রাজ্যের লোক আসিয়া জমিতেছিল। সকলে বৃত্তি পাইবে। নানা বৃত্তি—কাপড়, পিলসুজ, ঘড়া, গামছা পূজার যত কিছু সামগ্রী যায় নৈবেদ্য পর্যন্ত বৃত্তি বিলি হইবে। কুমারীশও এই গ্রামের মুখে আসিতেছিল, তাহারও পাওনা অনেক। পরনে তাহার নতুন লালপেড়ে কোরা কাপড়, গলায় কোরা চাদর, বগলে ছাতা, হাতে একটা পুঁটলিতে বাঁধা কয়টি মাটির পুতুল ও খেলনা। সে হনহন করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল।

প্রতিমা-বাহকেরা জল হইতে দেবী-প্রতিমার খড়ের ঠাট তুলিয়া আনিয়া চণ্ডীমণ্ডপে নামাইয়া দিয়া বিদায়ের জন্য দাঁড়াইল। তাহারা চাহিল, মা, বেসজ্জনের বিদেয় আমাদের—মুড়কি নাড়ু!

ঠিক এই সময়েই বাড়ির ঝিটা দেখিল, বাড়ির খিড়কির ঘাটেই যমুনার দেহ ভাসিতেছে। তাড়াতাড়ি তোলা হইল—বিবর্ণ শবদেহ। অমূল্য আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া পড়িল।

কুমারীশ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া গেল।

রসকলি

পাল-পুকুরের ঘাটের উপরেই প্রকাণ্ড বটগাছটার একটা শিকড় বিশাল অজগরের মতো কুণ্ডলী পাকাইয়া গর্তের ভিতর মুখ সেঁধাইয়া যেন পিঠে রোদ পোহাইতেছে। পুলিন দাস তাহার উপর হাঁটুভাঙা দয়ের মতো উবু হইয়া বসিয়া জলে খোলামকুচি ছুঁড়িয়া 'ব্যাং-ছুড়ছুড়ি' খেলিতেছিল; তাহার কাঁধে গামছা, কানে একটা পোড়া বিড়ি।

মিতে বলাই দাস আসিয়া ডাকিল, এই যে পেলা, উঠে আয়, ওরে ও খেপাচণ্ডী, উঠে আয়! খুড়ো যে—

পুলিন হাতের খোলামকুচিটা জলের পরিবর্তে মাটিতে আছড়াইয়া কহিল, টেঁসেছে বেটা বুড়ো?

বলাই সোৎসাহে কহিল, আর দেরি নাই, উঠে আয়।

উভয়েই গ্রামের পথ ধরিল, বলাই আগে, পুলিন পিছনে।

পুলিন সহসা কহিল, বউটা খুব কাঁদছে, নয় রে বলা ?

বলা কহিল, খু-উ-ব, আছাড়-বিছেড় করছে।

মাথাটা তাহার প্রায় ঘাড়ের নিকটে হেলিয়া পড়িল, ঠোঁট দুইটা চিবুক পর্যন্ত বাঁকিয়া গেল।

আবার উভয়েই নীরব, রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে। একটা গাই রাস্তার ধারে পতিত জমিতে লম্বা দড়িতে বাঁধা, ঘাস খাইতেছিল। জানি না, পুলিন কোন্ কৌতুকে চট করিয়া বাঁ হাতের দুইটা আঙুলে গাইটার পিঠটা টিপিয়া টিপিয়া ঘড়-ড়-ঘোঁত শব্দে নাসিকা-গর্জন করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে গাইটাও মাথা নাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল।

পুলিন সলম্ফে হাত দুই সরিয়া আসিয়া কহিল, মাইরি, কী ত্যাজ রে! আমার বউটাও ঠিক এমনই, মাথা নেড়েই আছে।

পুলিনচন্দ্রের এক দেহশ্রী ভিন্ন আর কিছুই প্রশংসা করিবার মতো ছিল না।

তাহার দেহখানি সুন্দর, দীর্ঘ আকার, সবল দেহ, বর্ণ গৌর, কোঁকড়া চুল, আর সর্বাঙ্গ বেড়িয়া বেশ একটি মিষ্ট লাবণ্য। এ ছাড়া আর কোনো গুণই ছিল না। বুদ্ধির খ্যাতি তো কোনো কালেই নাই, বাল্যকালেই পাঠশালায় গুরুমহাশয়, 'এক পয়সায় তিনটে আম, তা তিনটে আমের কত দাম' ঝাড়া তিনটি ঘণ্টাতেও বুঝাইতে না পারিয়া নিজেই তাহার বই-দপ্তর গুছাইয়া বগলে পুরিয়া দিয়া কহিয়াছিলেন, বাবা, শুভঙ্কর যে এ জন্মে বৈরাগী-কুলে জন্ম নিয়ে হিসেবে পর্যন্ত বৈরাগ্য করেছেন, তা জানতাম না। তোমায় পড়ানো আমার কর্ম নয়।

ইহার উপর সে ছিল যেন মূর্তিমান বে-তাল।

মজলিশে হয়তো লঙ্কাকাণ্ডের মতো ভীষণ গম্ভীর আলোচনা চলিতেছে, বুড়া জাম্বুবান হয়তো মন্ত্রণা দিতেছে, মজলিশসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত, নিস্তব্ধ, সহসা সেখানে পুলিনচন্দ্র যেন কৌতুকের কাতুকুতুতে গুলগুল করিয়া হাসিয়া উঠে—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, এ মাইরি আমার খুড়োকে লিখেছে, তেমুণ্ডে বুড়ো—ইয়া চুল, ইয়া দাড়ি, ঠিক ঠিক, জাম্বুবান, জাম্বুবান—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ!

আবার হয়তো হনু-ভাম্বুর মিতালির রঙ্গে মজলিশ তো মজলিশ, দেবগণ পর্যন্ত হাসিয়া আকুল, সেখানে পুলিন বিস্ময়ে হতবাক, চক্ষু দুইটা ছানাবড়ার মতো বিস্ফারিত, পাশের লোককে বলে, কি মাইরি যে হাসিস, তার ঠিক নাই। তারপর

সোৎসাহে বাহবা দেয়, বলিহারি বাপ হনু, বাবুদের প্যায়দার চেয়েও তুমি জিন্দে পালোয়ান।

গ্রন্থকারও বাদ যান না, পুলিন কহে, বইটার কিন্তু ভারি চহট মাইরি, এ একবারে অবাক-জলপান লাগিয়ে দিয়েছে !

আবার রাবণ-বধে সীতা-উদ্ধারে আনন্দিত শ্রোতৃমণ্ডলী আবেগে জয়ধ্বনি করিয়া উঠে। বিচিত্র পুলিন, বিচিত্র তাহার রসবোধ, সে সজল চক্ষে বলে, আহা-হা এতগুলো বেধবা হল, আহা হা !

আবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যগ্র অনুসন্ধানে কহে, আচ্ছা, লঙ্কায় তা হলে মাছের সের কত করে হল ? এক পয়সা, না দু পয়সা ? —তা লেখে নাই ?

লোকে তাই বুদ্ধিহীনের উপর রং চড়াইয়া কহে, ক্যাপা।

পুলিন রাগে না, হাস্যমুখে উত্তর দেয়, অঁ্যা।

রাগে একজন, আর লজ্জায় দুঃখে মরিয়া যায় আর একজন। দুই জনের প্রথমটি পুলিনের স্ত্রী, বয়স আঠারো-উনিশ, গোলগাল আঁট-সাঁট দেহ, নাম গোপিনী।

কিন্তু পুলিন কহে, সাপিনী। পুলিনের নির্বুদ্ধিতার লজ্জায়, খোঁচায় গোপিনী রাগে সাপিনীর মতোই গর্জায় ; কথাগুলিও বাহির হয় সাপিনীর জিহ্বার মতোই, লকলকে তীক্ষ্ণ ভয়াবহ। নির্বোধ, সর্বজনের হাস্যাস্পদ স্বামীর ঘরে শত লজ্জার মধ্যেও সান্ত্বনার একটি আশ্রয় গোপিনীর মিলিয়াছিল, সে ওই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি, যে পুলিনের জন্য লজ্জায় দুঃখে মরমে মরিয়া থাকিত ; সে পুলিনের বৃদ্ধ খুড়ো রামদাস মোহান্ত, যাহার সহিত পুলিন জাম্বুবানের সাদৃশ্য দেখিতে পায়।

রামদাসের অবস্থা বেশ ভালোই, মোটা জোতজমা, উঠানে বড় বড় মরাই, ঘরে দুগ্ধবতী গাভী, গ্রামে দু-দশ টাকার তেজারতি।

তবে তাহার চেহারাটা আজ শুধু চুল-দাড়ির জন্যই নয়, চিরকালই কেমন বেয়াড়া বিশ্রী ; তাই যৌবনে যখন সে শ্রীমতীকে লইয়া পরম আগ্রহে সংসার পাতিয়াছিল, তখন শ্রীমতী রামদাসের ওই বদ চেহারার জন্যই নাকি তাহার পাতানো সংসারে লাথি মারিয়া কোথায় একদিন উধাও হইয়া গিয়াছিল।

গৃহী-বৈরাগীর বংশধর রামদাস শ্রীমতীর সন্ধানে হরেক রকম তালি দেওয়া আলখাল্লা পরিয়া ঝোলা কাঁধে ভবঘুরে ভিখারী বৈরাগী সাজিল, শোকে সংসারকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল, কিন্তু সংসার তাহাকে ছাড়িল না।

শ্রীমতীর সন্ধান মিলিল না, কিন্তু তাহার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে কোন্ দিন শ্রী

আসিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাকে সংসারের দিকে ফিরাইল; তখন ভিক্ষার সঞ্চয়েই তাহার তিনশো টাকা পুঁজি, আর বাড়ির জোতজমার ধান ঠিকাদার-ভাগদারের কাছে বেশ মোটা হইয়াই জমিয়াছিল। শ্রীমতীর অভাবে রামদাস শ্রীকে লইয়া বেশ আঁটালো করিয়া সংসার বাঁধিল।

পাঁচজনে কহিল, মোহান্ত, এইবার ভালো করে সংসার পাতো, একটি ভালো দেখে বোষ্টমী।

রামদাস কহিল, রাধে, রাধে, ও কথা ছাড়ান দাও দাদা। রাধারানী আমার মনেই ভালো, ধ্যানেই সোজা, বাইরে বেজায় বাঁকা। বাঁকা রায়ের লাঞ্ছনাটাই দেখ না! জয় রাধে, শ্রীমতী শ্রীমতী!

কে একজন স্ত্রী-জাতির কী-একটা নিন্দা করিল, মোহান্ত মাথা নাড়িয়া জিভ কাটিয়া সবিনয়ে প্রতিবাদ করিল, রাধে রাধে, ও কথা বোলো না, বলতে নাই। শ্রীমতীর জাত, ওরা সবাই ভালো।

একজন ঠোঁটকাটা কঠোর রসিকতা করিয়া ফেলিল, তা তোমার শ্রীমতী—

মোহান্ত হাসিয়া কহিল, বললাম যে দাদা, শ্রীমতীর জাত ওরা, সুন্দর নিয়েই যে কারবার ওদের। অসুন্দরকে কে কবে পছন্দ করে দাদা?

এই সময় রামদাসের বড় ভাই শ্যামদাস বছর আষ্টেকের ফুটফুটে মাতৃহীন পুলিনকে রাখিয়া মারা গেল। রামদাস পুলিনকে বুকে করিয়া 'না বিইয়াই শ্যামের মা' হইয়া উঠিল।

সুন্দর পুলিন বড় হইল। বৈষ্ণবের ছেলে, কীর্তনের আখড়ায় খোল-করতাল ছাড়িয়া লাঠির আখড়ায় লাঠি ধরিতে শিখিল। বলা সঙ্গী হইল, গাঁজা ধরিল। রামদাস শাসন করিতে পারিল না, শুধু দুঃখই করিল; তবু মনে মনে নিজেই সান্ত্বনা খুঁজিয়া হইল, বেশ একটি গোছালো বউ আসিলেই পুলিন মানুষ হইবে, বোকা বুদ্ধিমান হইবে, ঘর বুঝিবে, না বুঝে ঘর ঘাড়ে চাপিয়া পরিচয় করিয়া লইবে।

রামদাস পুলিনের জন্য পাত্রী খুঁজিতে লাগিল।

সৌরভী বৈষ্ণবী আসিয়া কহিল, মোহান্ত, তা আমার মঞ্জরীর সঙ্গে পুলিনের বিয়ে দাও না কেন? ছেলেবেলার সাথী দুটি, ভাবও খুব—

রামদাস কহিল, রাধে রাধে, তা যে হয় না সৌরভী, আমরা হলাম জাত-বোষ্টম, আর তোমরা ভেকধারী।

সৌরভী ছিল ধোপার মেয়ে, ভেক লইয়া বৈষ্ণবী হইয়াছে। তাহার মেয়ের সঙ্গে ভাইপোর বিবাহ দিতে রামদাসের রুচি হইল না। না হইলে সৌরভীর মেয়ে মঞ্জরী বেশ সুশ্রী, বেশ নজরে-ধরা মেয়ে। তবে একটু রসোচ্ছলা, যাকে বলে 'ডগমগ' ভাব,

সেই ভাবে সে চঞ্চল। চলিতে তাহার দেহে হিল্লোল খেলিয়া যায়, কথা বলিতে হাসি উপচিয়া পড়ে। হাসিতে নিটোল গালে টোল পড়ে, সে গ্রীবাটি ঈষৎ বাঁকাইয়া দাঁড়ায়। নাকে রসকলি কাটে, চূড়া বাঁধিয়া চুল বাঁধে, কথার ধরনটাও তাহার কেমন বাঁকা। লোকে কত কি বলে, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না। নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতও বন্ধ হয় না।

মঞ্জরী পুলিনের চেয়ে বছর চারেকের ছোট, বাল্যসাথী, দুইজনের ভাবও খুব। পুলিন সময়ে-অসময়ে মঞ্জরীদের বাড়ি যায়, মঞ্জরী সাদরে অভ্যর্থনা করে, মুখে দীপ্তি ফুটিয়া উঠে, রসোচ্ছলা আরও উচ্ছল হইয়া উঠে।

পুলিন বলে, কী হে রসকলি, করছ কী?

দুইজনে 'রসকলি' পাতাইয়াছে।

মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া সুরে বলে—

"তোমায় আঁকছি হে অঙ্গে যতন করে।"

পুলিন এ কথার উত্তর খুঁজিয়া পায় না।

অভাব-অভিযোগে কত দিন মঞ্জরীর মা সৌরভী আসিয়া কহে, দেখ লো মঞ্জরী, দুটো টাকা কারু কাছে পাওয়া যায় কিনা, নইলে তোর খাড়ুটা বাঁধা দিতে হবে।

মঞ্জরী বলে, খাড়ু আমি বাঁধা দেব না রসকলি। তুমি টাকা এনে দাও।

পুলিন শশব্যস্তে বলে, সে কি রসকলির মা, খাড়ু বাঁধা দেবে কি? আমি টাকা এনে দিই।

সৌরভী আপত্তি করিলে মঞ্জরী কহে, কেন, রসকলি কি আমার পর?

খুড়ার তহবিল সন্ধান করিয়া না পাইলে চাউল বিক্রয় করিয়া সে টাকা আনিয়া দেয়।

আবার মঞ্জরী কখনও কখনও পুলিনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে, না, তুমি দিতে পাবে না, ও মায়ের চালাকি।

মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া হয়, পুলিন ব্যস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু মঞ্জরী কহে, খবরদার, আড়ি করব।

দশ বছর বয়সেই মঞ্জরীর একবার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু পাত্রটিকে মঞ্জরীর পছন্দ হয় নাই, তাই তাহাকে সে নাকচ করিয়া দিয়াছে। সে বেচারী বহুবার মঞ্জরীর জন্য হাঁটাহাঁটি করিয়া শেষে অন্যত্র বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছে। মঞ্জরীকে ছাড়পত্র করিয়াছে।

নানা কারণে রামদাস সৌরভীকে প্রত্যাখ্যান করিল।

রামদাস সৌরভীকে ফিরাইয়া দিল; সৌরভীও ঘরে গিয়া পুলিনকে ফিরাইয়া

দিল, কহিল বাবা, মেয়ের আমার সোমত্ত বয়েস, তুমি আর এস না। একেই তো পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। মনে ভেবেছিলাম, তোমরা দুটি ছেলেবয়সের সাথী, দু হাত এক করে দিয়ে দেখে চোখ জুড়োব, তোমার কাকা তা দেবে না। আমাকে তো আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে!

কথাটা পুলিনের বড় বাজিল, সে দুই দিন খাইল না, শুইল না, মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইল।

রামদাস শেষে রাজী হইল, বেশ মঞ্জরীর সঙ্গেই পুলিনের বিবাহ হোক।

সময়টা হোলির, রামদাস শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবে। তাই স্থির হইল যে, রামদাস ফিরিলে বিবাহ হইবে।

কিন্তু উপর-ওয়ালার অভিপ্রায় অন্যরূপ।

শ্রীধামে সহসা একদিন রামদাসের সঙ্গে হারানো শ্রীমতীর দেখা হইয়া গেল। শ্রীমতী তখন গাছতলায় কলেরায় ছটফট করিতেছে, পাশে বারো-তেরো বছরের মেয়ে গোপিনী বসিয়া বসিয়া অঝোর-ঝরে কাঁদিতেছিল।

স্ত্রীলোকটির কাতরানিতে আর বালিকাটির কান্নায় দয়াপরবশ হইয়া রামদাস সাহায্যে অগ্রসর হইয়া রোগিণীর পাশে বসিল, ক্ষণেক তাহার মুখপানে চাহিয়া সাগ্রহে ডাকিল, শ্রীমতী!

রোগযন্ত্রণায় কাতর শ্রীমতী রামদাসের মুখপানে চাহিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, রামদাস উত্তরীয়-প্রান্ত দিয়া চোখ মুছাইয়া দিল। শ্রীমতী তাহার পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আমার যাবার সময়, পায়ের ধুলো দাও। আর এই মেয়েটিকে নাও। বড় ভালো মেয়ে, মায়ের মতো নয়, পার তো পুলিনের সঙ্গে বিয়ে দিও। ভয় নেই, অজাতের মেয়ে নয়। সেই যে, বাউল প্রেমদাসকে মনে পড়ে, সেও জাত-বোষ্টম, তারই মেয়ে।

রামদাস কাতর কণ্ঠে কহিল, শ্রীমতী, রাধারানী, আমি যে তোমার তরে আজও শূন্য ঘর বেঁধে বসে আছি।

শ্রীমতী সে কথার কোনো উত্তর দিল না, শুধু কন্যা গোপিনীকে কহিল, মা, এই তোর বাপ, এঁর সঙ্গে যা, আমার চেয়েও আদরে রাখবে। আর একটা কথা গোপিনী, কখনও যেন স্বামী ছাড়িস নি, হই বোষ্টম, থাকুক নিয়ম, তবু ওতে সুখ নেই।

শ্রীমতীকে বৃন্দাবনে বিসর্জন দিয়া গোপিনীকে লইয়া রামদাস বাড়ি ফিরিল।

সৌরভীকে ডাকিয়া পঞ্চাশ, একশো, শেষে দুইশোটি টাকা হাতে দিয়া কহিল, সৌরভী, আমায় বাকি্য থেকে খালাস দাও।

একমুঠা টাকা খুঁটে বাঁধিয়া সৌরভী হাসিমুখেই বাড়ি ফিরিল।

সৌরভী মঞ্জরীর জন্য পাত্র ঠিক করিল, কিন্তু মঞ্জরী কহিল, না।

মা শেষে রাগ করিয়া রামদাসের টাকা লইয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেল।

মঞ্জরী দুই দিন কাঁদিল; তারপর আবার উঠিল, ক্রমে হাসিল, রসকলি কাটিল, কিন্তু বিবাহ করিল না।

এদিকে পুলিনের সঙ্গে গোপিনীর বিবাহ হইয়া গেল। পুলিন যেন মঞ্জরীর নেশা ভুলিল। সে দিন-রাত্রি ঘরেই থাকে, বাড়ির বাহির হয় না, দেখিয়া রামদাস সুখে হাসিল। মঞ্জরী দুই-চারি দিন পুলিনের অপেক্ষা করিয়া শেষে একদিন চূড়া করিয়া চুল বাঁধিয়া, নাকে রসকলি কাটিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে রামদাসের বাড়িতে আসিয়া উঠিল। রামদাস তখন বাড়িতে ছিল না; উঠানে দাঁড়াইয়া মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া ঘরের রুদ্ধ দ্বারকে উদ্দেশ করিয়াই বলিল, কই হে রসকলি, বউ দেখাও হে!

পুলিন ঘরের ভিতর গোপিনীর সহিত কথা কহিতেছিল, মঞ্জরীর আওয়াজ পাইয়া অন্য দুয়ার সে দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। গোপিনী নতমুখে ঘরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। মঞ্জরী ঘরে ঢুকিয়া গোপিনীর ঘোমটা তুলিয়া দেখিয়া ঠোঁটের আগায় পিচ কাটিয়া কহিল, তুমি বউ?

গোপিনী মুখ তুলিয়া চাহিল।

মঞ্জরী আবার কহিল, তা হ্যাঁ বউ, রসকলির তোমাকে পছন্দ হয়েছে?

গোপিনী এবার কথা কহিল, যেন চিমটি কাটিয়া কহিল, না।

মঞ্জরী বলিল, বাঃ, এই যে পাখি পড়ে বেশ! তা হ্যাঁ বউ, কেন পছন্দ হয় নি, কিছু জেনেছ?

গোপিনী সেই চিমটি কাটার মতোই কহিল, রসকলি কাটতে জানি না কিনা, তাই।

মঞ্জরী সব বুঝিল, এবার সে হাসিয়া বিস্ময়ের ভঙ্গিতে গালে হাত দিয়া কহিল, ওমা, তাই নাকি? তা আমার কাছে রসকলি কাটা শিখবে বউ?

গোপিনী কহিল, শেখাবে? দেখো, ঠিক তোমার মতনটি হওয়া চাই।

মঞ্জরী কহিল, তাই শেখাব, কিন্তু ধৈরয ধরে থাকা চাই। পারবে তো?

গোপিনী কহিল, পারব, কিন্তু তোমার সময় হবে তো? বলি, আসবে কখন? রসময়রা ছাড়বে তো?

মঞ্জরী এবার ঠেকার দিয়া কহিল, আমার রসময়রা নয় অসময়ে এসে সময় দেবে। তোমার রসময় যে এক দণ্ড ছাড়ে না দেখি!

গোপিনী কহিল, ও দুদিন, এখন নতুন নতুন নালতের শাক হে। তারপর বুড়ো গোরু ঠিক দামে গিয়ে পড়বে, ভয় নাই।

মঞ্জরী একটু ঝঙ্কার দিয়া কহিল, তা ভাই, বুড়ো গোরু বেঁধে রাখলেই হয়! যার দড়ি নাই, তার আবার গোরু পোষার শখ কেন?

গোপিনীও এবার একটু ঝঙ্কার দিয়া কহিল, ঘোড়া হলে কি চাবুকের অভাব হয় হে, তা হয় না। যখন গোরু পুষেছি তখন দড়ি কি না জুটবে? বলি, পরনের কাপড়ে আঁচল তো আছে, তাতেই বাঁধব।

মঞ্জরী হাসিয়া কহিল, যদি ছিঁড়ে পালিয়ে যায়?

গোপিনী কহিল, ইস, সাধ্যি কি!

মঞ্জরী কহিল, দেখো।

গোপিনী সেই দম্ভভরেই কহিল, তখন না হয় ছেঁড়া আঁচল গলায় দিয়ে ঝুলব হে, তা বলে জ্যান্তে তো আর ভাগাড়ে দিতে পারি না!

ইহার পর মঞ্জরী আর কথা কহিল না, আচমকাই যেন বাড়ি ফিরিল, তখন মুখখানায় হাসি ছিল না, যেন থমথমে জলভরা মেঘ।

পরদিন হইতে রসকলির বাড়িতে পুলিনের আদর যেন বাড়িয়া গেল। লোক পাঠাইয়া পুলিনকে আনাইল, তাহার লজ্জা ভাঙিয়া দিল। এখন আর পুলিনের গাঁজার আড্ডায় মঞ্জরী ঝঙ্কার দেয় না। সঙ্গী বলাকে দেখিয়া বিরক্ত হয় না। এখন কথায় কথায় মঞ্জরী যেন ঢলিয়া পড়ে। পান দেয়। পুলিন আবার বাড়ি ছাড়িল, পূর্বের চেয়ে যেন বেশি শক্ত করিয়া মঞ্জরীর বাড়িতে আড্ডা গাড়িল।

মঞ্জরী মাঝে মাঝে আবার এও বল্পে, রসকলি, এ তো ভালো কাজ হচ্ছে না।

পুলিন হোঁতকার মতো কহে, কি!

মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া বলে, এই—আমার বাড়িতে এমন করে চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে থাকা।

পুলিন তেমনি ভাবেই বলে, কেন?

মঞ্জরী সুর করিয়া গান ধরে—

“পাঁচ সিকের বোষ্টুমি তোমার,
ওহে গোসা করেছে, গোসা করেছে।”

পুলিন কহে, ধ্যেত।

গোপিনী সত্য সত্যই রাগ করিল, কিন্তু ভাঙায় কে? যাহার উপর মান, সেই যে

মানের মুখে ছাই দিয়া দিল। সে খাবার সময় আসে, দুইটা খায়, দেশের দশের হাস্তাম্পদ হইয়া ফেরে, মঞ্জরীর বাড়ি আড্ডা জমায়, ঘরের পয়সা পর্যন্ত মঞ্জরীর ঘরে তুলিয়া দিয়া আসে। মঞ্জরীর না-কি সোনার নথ হইতেছে, গোপিনী জ্বলিয়া গেল। পুলিন যা দুই-চারিটা কথা গোপিনীর সহিত কয়, তা পর্যন্ত মঞ্জরী-বিশোভিত। সেদিন রাত্রে কথায় কথায় নির্বোধ কহিল, রসকলি তোমার কি নাম দিয়েছে জান গা? গোপিনী নয়, সাপিনী। তা সত্যি, সবেতেই তোমার ফোঁস।

গোপিনী একটা জলন্ত অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ হানিয়া ছুটিয়া পলাইল। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বাহিরে কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, সে বলিয়াছিল, যদি আঁচল ছেঁড়ে তবে ছেঁড়া আঁচল গলায় দিয়া ঝুলিবে। উদ্‌ভ্রান্ত ব্যথাহত নারী সত্যই আঁচল ছিঁড়িয়া দড়ি পাকাইতে বসিল। ঘরে পুলিন তখন অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে, বুঝি বা রসকলিকে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া বৃদ্ধ মোহান্ত বাহির হইল, শ্বেতবস্ত্রা গোপিনীকে দেখিয়া চমকিয়া কহিল, কে? কে? একি মা? বাইরে কেন, মা আমার?

গোপিনী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বৃদ্ধের স্নেহস্পর্শে তাহার হাতের পাকানো আঁচল এলাইয়া খুলিয়া গেল।

মোহান্ত গোপিনীকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া কহিল, মা, বুড়ো ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ধৈর্য ধর, মা আমার, আমি আশীর্বাদ করছি—ভালো হবে, ভালো হবে তোর।

পুলিনের ব্যবহারে শান্ত স্নেহ-দুর্বল বৃদ্ধ মরমে মরিয়া গেল। কঠোর হইতে চেষ্টা করিল, পয়সায় টান দিল, কথা বন্ধ করিল, কিন্তু তবুও যে পুলিন সেই পুলিনই রহিয়া গেল। অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন!

শুধু রসকলির বাড়িতে বসিয়া বলার সহিত খুড়ার আয়ুর দিন গণনা করিতে লাগিল।

রামদাস কিন্তু বাঁচিতে চাহিয়াছিল, মরমে মরিয়াও গোপিনীর জন্য বাঁচিতে চাহিত। সর্বদা তাহার ভাবনা হইত, সে মরিলে গোপিনীর দশা কি হইবে?

কিন্তু মানুষ অমর নয়, মরণের পরোয়ানা সঙ্গে লইয়াই জন্ম লওয়া। সহসা একদিন রামদাসের তলব আসিল। মোহান্তের বয়স হইয়াছিল, হাঁপানি ছিল, হঠাৎ একদিন হাঁপানি মৃত্যুর মূর্তিতে বুকে চাপিয়া বসিল।

গোপিনী চোখের জলে বুক ভাসাইয়া সেবা করিতে বসিল। পাড়া-পড়শী

আসিয়া জমিল। মোহান্ত যেন কার অনুসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু সে তখন পাল-পুকুরের ঘাটে বসিয়া 'ব্যাং-ছুড়ছুড়ি' খেলিতেছিল।

পাড়াপড়শী ভিড় জমাইয়া বসিয়া আছে, কেহ বলে, মোহান্ত, হরি বল, বল—জয় রাধারানী!

রাধারানীর জয়গানে চিরমুখরকণ্ঠ চারণ কিন্তু আজ এ সময়ে রাধারানীর ধ্যান করিতে পারিল না। মৃগমায়াচ্ছন্ন রাজা ভরতের মতো শুধু বলিল, মা গোপিনী, কিছু করতে পারলাম না মা।

গোপিনী শেষে আছাড় খাইয়া পড়িল। হায়, তাহার নীড় যে ভাঙিয়া যায়! ভ্রষ্টনীড় বিহঙ্গিনীর ক্রন্দন ছাড়া আর উপায় কী? পাড়ার মেয়েরা দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু কেহ এই গোপিনীকে ধরিতে সাহস করিল না। বুড়া রোগী, কখন শেষ নিশ্বাস পড়িবে, খাবি খাইয়া মরিবার নোটিসও হয়তো দিবে না। মড়া ছুঁইয়া কে অশুচি হইবে!

ধরিল শেষে একজন। সে মঞ্জরী।

মঞ্জরী আসিয়াই শোকবিহ্বলা গোপিনীকে ধরিল। কহিল, ভয় কী?

মুমূর্ষু মোহান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া টানিয়া টানিয়া কহিল, গ্রামের পাঁচজন আছেন, আমার শেষ ইচ্ছা বলে যাই। আমার স্থাবর সম্পত্তির মালিক হল গোপিনী। আর সকলের কাছে এই ভিক্ষে, ছেলেটাকে যেন ওই বেশ্যের হাত হতে বাঁচিও।

কথাটায় সকলের চক্ষু গিয়া পড়িল মঞ্জরীর উপর। সকলেই ভাবিতেছিল, সে কী করিয়া বসে, সে কী করিয়া বসে! কিন্তু মঞ্জরী গোপিনীর এলানো দেহখানি পরম সান্ত্বনাভরে জড়াইয়া বসিয়া ছিল। বসিয়াই রহিল, চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

মোহান্ত যখন কথাটা আরম্ভ করে, তখনই বলার সঙ্গে পুলিন আসিয়া পৌছিয়া ছিল, সেও কথাটা শুনিল।

কথাটা আজ তাহাকে প্রথম আঘাত দিল, মান-অপমানের স্বাদ আজ সে বুঝি প্রথম বুঝিল।

লোকে তখন মোহান্তের শেষ ইচ্ছার সমালোচনায় ব্যস্ত। পুলিন দাওয়া হইতে নামিয়া পড়িল, কেহ লক্ষ্য করিল না; কিন্তু মঞ্জরী ডাকিল, যাচ্ছ কোথা?

পুলিন কহিল, আর এ বাড়িতে নয়।

মঞ্জরী কহিল, ছিঃ এই কি রাগের সময়! এসো, খুড়োর মুখে জল দাও, কানে নাম শোনাও।

পাড়াসুদ্ধ লোক এই বেহায়া মেয়েটার সীমাহীন নির্লজ্জতায় অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মেয়েরা গালে হাত দিল। পুলিনও মঞ্জরীর মুখপানে চাহিল,

তারপর ধীরে ধীরে খুড়ার শিয়রে বসিয়া মুখে গঙ্গাজল দিল, ডাকিয়া কহিল, বল কাকা, জয় রাধারানী!

বৃদ্ধ কহিল, জয় রাধারানী। দয়া কর মা, অনাথিনী দুঃখিনীকে দয়া কর মা!

বেলা আড়াই প্রহরের সময় রামদাস মরিল, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইতে রাত্রি এক প্রহর হইয়া গেল।

তখন মঞ্জরী গোপিনীকে কহিল, তবে আমি আসি।

গোপিনী বলিল, এসো।

মঞ্জরী চারিদিক চাহিয়া সরলভাবেই কহিল, কত্তা কই? একাটি থাকতে ভয় করবে না তো?

গোপিনীর মনে হইল, মঞ্জরী বুঝি তাহাকে ঠাট্টা করিল। সে উত্তর করিল, আসা-যাওয়া যখন একা, তখন একা থাকতে ভয় করলে চলবে কেন? আর একাই তো থাকা এক রকম।

মঞ্জরী কথাটা গায়ে না লইয়া কহিল, আমি কিন্তু ভাই, একা থাকতে পারতাম না।

গোপিনী কহিল, আমি হলে একা থাকতে যদি না পারতাম, গলায় দড়ি দিতাম, তবু—

মঞ্জরী এবার একটু ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল, বালাই, ষাট, মরব কেন? আসি ভাই, কিন্তু রসকলি গেল কোথা?

গোপিনী ক্ষিপ্তের মতো কহিল, রসকলি নাকেই আছে, ঘরে গিয়ে আয়না নিয়ে দেখ, পোড়া মুখের উপরেই ঝলমল করছে।

মঞ্জরী এই আকস্মিক আঘাতে যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়াও কিন্তু শেষটা উত্তরের বেলায় বলিয়া ফেলিল, রসকলি তো নিজের নাকেই থাকে বউ, এ যে কেড়ে নেওয়া যায় না! তা তুমি যদি চাও তো না হয় দেবার চেষ্টা করি।

গোপিনী ফোঁস করিয়া বলিয়া দিল, কী বললে তুমি? তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে আমি চাই নে, চাই নে। যাও তুমি, যাও।

কথাগুলি ক্রুদ্ধ এক-নিশ্বাসে বলিয়াই সে ঘরে ঢুকিয়া মঞ্জরীর মুখের উপরেই দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

মঞ্জরী ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিল, বুকের ভিতর তাহার যেন আগুন জ্বলিতেছিল। সাপিনীর এত বিষ! আপনার বিষে হতভাগিনী আপনি জর্জর হইয়া মরুক।

আপন বাড়ি ঢুকিতেই মঞ্জরী দেখিল, পুলিন তাহার দাওয়ার উপর বসিয়া।

মঞ্জরীর দেহ ব্যাপিয়া একটা হিল্লোল বহিয়া গেল। হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া

পুলিন উঠিয়া কহিল, রসকলি!

মঞ্জরী হাসিয়া উত্তর দিল, বোসো, বলি।

পুলিন বসিল।

ঘরের তালা খুলিতে খুলিতে মঞ্জরী বলিল, রসকলি, তুমি ভাই সোনাকপালে পুরুষ। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন।

পুলিন খুব রাগিয়াই কহিল, ও ধন আমার ভাদ্দর-বউ, ছুঁতে পাপ।

মঞ্জরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল, আর বউটি? কি গো, চুপ করে রইলে যে? উত্তর দিতে পারলে না? আচ্ছা, আমিই বলে দিই, সে তোমার গলার মালা, ঠোঁটের হাসি।

পুলিন কহিল, না রসকলি, হল না, সে আমার গলার ফাঁসি। ঠাট্টা নয় রসকলি, একটা কথা তোমায় বলতে এসেছি, আমি কাল থেকে নিজের বাড়িতে যাব। ও বাড়িতে আর থাকব না।

নিজের বাড়ি অর্থে পুলিনের পৈতৃক বাড়ি। বাস্তব চক্ষে বাড়িটি একটি মূর্তিমন্ত বিভীষিকা, কিন্তু কল্পনায় বাড়িটি বেশ, অর্থাৎ উঠানভরা বনফুল, প্রাচীর ভাঙিয়া সীমা অসীমে মিশিয়াছে, ঘরের ভিতরেও চাঁদের আলো খেলে।

মঞ্জরী কহিল, বেশ, তা ভালো, তারপর খাবে কি করে?

পুলিন চট করিয়াই কহিল, বোষ্টমের ছেলে, ভিক্ষে করে খাব।

মঞ্জরী কহিল, আরও ভালো; কিন্তু ভিক্ষেতে মেলে তো চাল, তা রাঁধবে কে? বউকে নিয়ে যাও।

পুলিন প্রবল প্রতিবাদে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

মঞ্জরী কহিল, কেন? আর তুমি 'না' বললেও সে যদি না ছাড়ে?

পুলিন কহিল, ছাড়বে না? মারের চোটে ভূত ছাড়ে, তা জান? হুঁ হুঁ, কথায় আছে, 'পড়লে পরে দুধু ভাতু, না পড়লে ঠেঙার গুঁতু'।

মঞ্জরী কহিল, বেশ। রসকলি আমার বলে ভালো, এ যেন সেই, 'ও পারেতে ধান পেকেছে লম্বা লম্বা শীষ, টুকুস করে মরে গেল লঙ্কার রাবণ'। তা যেন হল, আজ রাত্রের মতো তো বাড়ি যাও।

পুলিন বলিল, না, আর নয়।

মঞ্জরী পরিহাস-ছলেই কহিল, তবে আজ রাতটা পাল-পুকুরের বটগাছেই কাটাবে নাকি?

পুলিন কহিল, না, তোমার দাওয়াতেই পড়ে থাকব।

মঞ্জরী হাসিল, দুই আর দুইয়ে চার হয়—এ কথাটা যে বুঝে না, সে চায়ের গুরুত্ব না বুঝিলে তাহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি?

তবু সে বলিল, লোকে বলবে কী?

পুলিন বাহির-দরজার দিকে ফিরিল।

মঞ্জরী কহিল, যাও কোথা?

পুলিন কহিল, দেখি, কোথাও—

মঞ্জরী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, যেতে হবে না, এসো, শোবে এসো।

পুলিন ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, লোকে বলবে কী?

মঞ্জরী কহিল, যা বলবার তারা বলেই নিয়েছে, আবার বলবে কী? শোন নি, আজই তোমার কাকা বললে, ওই—

পুলিন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোমার পায়ে ধরি রসকলি, ছি, ও কথা তুমি বোলো না।

মঞ্জরী হাসিয়া মৃদুস্বরে গান ধরিল।—

'লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী,
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী।'

পুলিন তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, স্পর্শে তাহার সে কি উত্তাপ! মঞ্জরী মৃদু আকর্ষণে হাতখানি ছাড়াইয়া শান্ত মধুর কণ্ঠে কহিল, ছাড়ো, বিছানা করি।

তকতকে ঘরখানি, লাল মাটি দিয়া নিকানো, আলপনার বিচিত্র ছাঁদে চিত্রিত; দেওয়ালে খান-কয়েক পট—সেই পুরানো গোরাচাঁদ, জগন্নাথ, যুগল-মিলন; সবগুলির পায়ে চন্দনের চিহ্ন। মেঝের উপর একখানি তক্তাপোশ, এক দিকে পরিষ্কার বেদীর উপর ঝকঝকে বাসনগুলি সাজানো।

তক্তাপোশের উপর গুটানো বিছানা বিছাইয়া দিয়া একটি ছোট চৌকির উপর রক্ষিত তোলা বিছানার গাদা হইতে দেখিয়া দেখিয়া একখানা 'সিজুনি' আনিয়া পুরাতন বিছানার উপর বিছাইয়া দিল। সিজুনিটি মঞ্জরীর নিজের হাতে অতি যত্নে প্রস্তুত, চারুশিল্পের অপরূপ ছাঁদ বিচিত্রিত। বিছানাটি বেশ করিয়া কয়বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া ডাকিল, এসো।

পুলিন ঘরে আসিয়া তক্তাপোশে বসিল। দেখিল, মঞ্জরী অভ্যাসমতো ঈষৎ

বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া।—সেই হাসি, সেই সব; শুধু দৃষ্টিটুকু নূতন। সে তখন মুগ্ধ, আবিষ্ট, একাগ্র।

পুলিন কথা কহিল, ভাবটা গদগদ কিন্তু সঙ্কুচিত, রসকলি!

মঞ্জরী চমক ভাঙিয়া কহিল, কি গো?

পুলিন কহিল, তুমি—তুমি—আমার—আমার—আমার—

কথাটা শেষ করিতে পারিল না, প্রতিবারই বাধিয়া যায়, আর পুলিন রাঙা হইয়া উঠে।

মঞ্জরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার—তোমার—তোমার কি গো?

কৌতুকে গ্রীবা বাঁকাইয়া খানিকক্ষণ পুলিনের নত লজ্জিত মুখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টি হানিয়া সহসা মঞ্জরী তাহার মুখ পুলিনের কানের কাছে লইয়া গিয়া বলিল, আমি তো তোমারই গো।

কথাটা বলিয়াই সে চট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, চঞ্চল লঘু গতিতে, ছোট ত্বরিতগতি ঝরনাটির মতোই। বাহিরে গিয়াই দরজা টানিয়া শিকল আঁটিয়া দিল। একরাশ দমকা দখিনা বাতাস আসিয়া যেন পুলিনকে তৃপ্ত করিয়া অন্তরকে দীপ্ত করিয়া আচমকাই চলিয়া গেল।

শিকল টানিয়া দিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ঢেঁকিশালায় আসিয়া মঞ্জরী আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রিতে পুলিন আসে নাই, বেলা এক-প্রহর হইয়া গেল, তবুও দেখা নাই। গোপিনী অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, সহসা সে সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিল, স্নান সারিয়া রান্না চড়াইল।

খুট করিয়া শব্দ হইল, ওই বুঝি আসিল! প্রবল অভিমানে ব্যগ্র দৃষ্টিকে রান্নার কড়ায় সে নিবিষ্ট করিল, হাতের খুন্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত অতি বিক্রমে ঘুরিয়া উঠিল, খন—খন—খন।

এই বুঝি ডাকে, সাপিনী হে!

পোষা বিড়ালটা দাওয়ায় লাফাইয়া উঠিয়া ডাকিল, ম্যাও—ম্যাও—ম্যাও।

আর দৃষ্টি মানিল না, ফিরিল; কিন্তু কই? শূন্য অঙ্গন, ভেজানো বহির্দ্বার—মানুষের বার্তা তো দিল না!

হাতের খুন্তিটা সজোরে বিড়ালটার পিঠে হানিয়া গোপিনী গালি পাড়িল, বেরো, বেরো, বেরো, আপদ বেরো।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল, গোপিনীর মনে হইল, বুঝি বা একটা যুগ।

সহসা বহির্দ্বার খুলিয়া বলাই আসিয়া দাওয়ায় বসিল। হাতের হুকা টানিতে টানিতে কহিল, শুনেছ মিতেনী, কাল রেতে মিতে যে মঞ্জরীর বাড়িতে—

বলাই পুলিনের মিতে, তাই গোপিনীকে ডাকিত—মিতেনী, গোপিনী ডাকিত—মিতে।

গোপিনী কহিল, শুনি নাই, তবে জানি।

বলাই বলিল, আবার নিজের ঘর সাফ হচ্ছে, সেইখানেই থাকবে, এ বাড়িতে থাকবে না।

একটা লজ্জা ঢাকিতে পাঁচটা লজ্জা মাথায় লইতে হয়। গোপিনী কহিল, আমিই যে থাকতে দেব না, সে আমি কাল বলে দিয়েছি, বাড়ি ঢুকলে ঝাঁটার বাড়ি দেব।

বলাই বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া বলিল, ও, তাই বুঝি এত! আবার মঞ্জরীকে পত্র করবে!

বুকে পাথর চাপা দিলেও মানুষ কাতরাইতে পারে, কিন্তু এই কথাটা এমন স্থানে গোপিনীকে আঘাত করিল যে, সে আর কথা কহিতে পারিল না।

বলাই কহিল, কাল রেতে জমিদার গাঁয়ে এসেছেন, তুমি নালিশ কর।

গোপিনী দীপ্ত প্রতিবাদে কহিল, না।

তারপর উভয়েই নীরব; গোপিনীর হাতের খুন্তি নড়ে না, চোখ কড়ার উপর কিন্তু দৃষ্টি নয়, পলকও পড়ে না।

বলাই মনে মনে কি যেন মক্স করিতেছিল, শেষে দালালির ভঙ্গিতে রসান দিয়া কহিল, বেশ বলেছ, সেই ভালো, ও 'দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভালো'।

তারপর আবার হুঁকায় টান পড়িল—ফড়ক ফড়ক। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল, আমাদের তো ছিঁড়লে মালা গাঁথতে আছে, ভাবনাই বা কি! ভাত থাকলে কি কাকের অভাব হয়, কি বল মিতেনী? আমি রয়েছি, সব ঠিক করে দেব তোমার।

পরিশেষে সম্মতির আশায় মিতেনীর মুখপানে চাহিল।

মিতেনী কোনো কথার উত্তর না দিয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। রান্না পুড়িতে লাগিল।

পুলিন কোদালি হাতে বাড়ি সাফ করিতেছিল। 'অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করে', পুলিন ঘামিয়া যেন নাহিয়া উঠিয়াছে। হাত টাটাইয়া উঠিয়াছে, শিরদাঁড়া টনটন করিতেছে, তবু কাজ সারা চাই। স্ত্রীলোকের অন্নদাস, ছিঃ—তার বড় লজ্জা আর কি!

মিতে বলাই আসিয়া কহিল, ভ্যালা রে মিতে, তা ভালো।

পুলিন কোদালি নামাইয়া বলিল, কল্কেতে কিছু আছে? হুঁকো লয়, অশুচ আমার।

বলা কলিকাটা খসাইয়া পুলিনকে দিল। ধুতরো-ফুলি ছাঁদে হাত কাঁদিয়া পুলিন টান মারিল—হুশ, হুশ হু—শ।

বলাই কহিল, তা এক কাজ করলি না কেন মিতে? জমিদার এসেছেন, তাঁর কাছে পাড়লে একবার হত না। তোর হল সোদর খুড়ো, আর ওর সৎবাবা, ওয়ারিশ হলি তুই, ও মাগী সম্পত্তির কে? চল তু একবার, দেখবি এখুনি তোর সম্পত্তি তোর হবে।

অদ্ভুত পুলিন, বিচিত্র তার সংসার-বোধ, সে কহিল, ওর কী হবে?

বলাই বলিল, তোর বউ—তুই খেতে দিবি।

পুলিন কহিল, না, না, আমি যে রসকলিকে—

বলাই সোৎসাহে কহিল, রসকলিকে পত্র করবি, ও মরুক গে—যা মন করুক গে। তোর কি?

সে যে নেহাত অমানুষী হয়, হাজার হউক সে স্ত্রী। মনটা পুলিনের মোচড় দিয়া উঠিল। পূর্বে তাহার সান্ত্বনা ছিল, তাহার প্রাপ্য ধনমূল্যে গোপিনীর নিকট মুক্তি পাইবার হকদার সে।

পুলিন বলিল, না মিতে, তা হয় না।

যেমন দেবা, তেমনই দেবী!—বলাই বিরক্তভাবে উঠিল, রাস্তা ধরিল জমিদারের কাছারির পানে।

পুলিন ভাঙা দাওয়াটার উপর ভাবিতে বসিল।

জমিদারের পশ্চিমা চাপরাসী আসিয়া ভাঙা কাঁসরের মতো খনখন করিয়া কহিল, আরে পুলিয়া, আসো আসো, বাবুকা তলব আসে।

পুলিন চমকাইয়া বলিল, ক্যানে, ক্যানে, কাহেসে দারোয়ানজী?

পশ্চিমা কহিল, সো হামি জানে না।

জমিদারের কাছারিতে পুলিন আসিয়া প্রণাম করিল।

বাবু করসিতে তামাক টানিতেছিলেন, গোমস্তা কলম পিষিতেছে। কয়জন মাতব্বর এধারে বসিয়া ছিল, আর ওধারে এক পাশে আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সঙ্কুচিতা গোপিনী।

বাবু পুলিনের দিকে চাহিয়া কাছারিকে উদ্দেশ করিয়াই কহিলেন, সে হারামজাদী কই ?

রাখাল পাইক বসিয়া ছিল, কহিল, আজ্ঞে, তিনি চানে গেল, আসছেন।

বাবু পুলিনকে বলিলেন, পুলিন, তোমার খুড়োর সম্পত্তি খারিজ করতে হবে।

পুলিন শশব্যস্তে কহিল, আজ্ঞে, সম্পত্তি আমার নয়, ওরই।

জোড়হস্তে অঙ্গুলি-নির্দেশে গোপিনীকে দেখাইয়া দিল।

বাবু কহিলেন, ওই হল হে, ওই হল, স্বামী আর স্ত্রী। মুখ থাকতে নাকে ভাত খায় কে হে ? আর তুমি থাকতে সম্পত্তির ও কে ? ও সম্পত্তি পেলে কি করে ? কথা কও গো, চুপ করে থাকলে চলবে না।

অগত্যা গোপিনী মৃদু কণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে, তিনি আমায় দিয়ে গিয়েছেন।

বাবু কহিলেন, তোমাকেই তবে খারিজ করতে হবে, পাঁচশো টাকা লাগবে।

পুলিন বলিল, আজ্ঞে, ও মেয়েমানুষ—

বাবু ধমক দিয়া কহিলেন, তুই থাম বেটা। বল গো, তুমি বল। আবার চুপ করলে যে, উত্তর দাও, পাঁচশো টাকা চাই আমার।

পথভ্রান্তকে যে পথ দেখাইয়া দেয়, সেই পথেই সে চলে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়া গোপিনী পুলিনের কথা ধরিয়াই বলিল, আজ্ঞে, আমি যে মেয়েমানুষ—

বাবু কহিলেন, আরে, সম্পত্তি তো মেয়েমানুষ নয়। আচ্ছা, না পার, সম্পত্তি তুমি পুলিনকে ছেড়ে দাও।

পুলিন শশব্যস্তে বলিল, আজ্ঞে না।

গোপিনীও বলিল, আজ্ঞে না।

বাবু চটিয়া কহিলেন, আচ্ছা, সম্পত্তি সদরে বাজেয়াপ্ত হবে। আর পুলিন, তুই বেটা ওই মঞ্জরীকে নিয়ে গাঁয়ে চলাচলি করছিস কেন ? ও সব হবে না, পরিবার নিয়েই থাকতে হবে।

অভিমান অনবুঝ, স্থানকাল জ্ঞান নাই ; পুলিন কিছু না বলিতেই গোপিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

প্রতিবাদে বাবু চটিয়া দীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, চোপরাও হারামজাদী, ওই পুলিনকে নিয়েই তোকে থাকতে হবে।

গোপিনী আঁতকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঠিক তখনই মঞ্জরী আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, বাবু, আমায় তলব করেছেন ?

বাবু মুখ ফিরাইয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না। সম্মুখে রসোচ্ছলা মেয়েটি

—চূড়ার মতো চুল বাঁধা, নাকে রসকলি আঁকা, মুখে মিষ্ট হাসি, গালে দুইটি ঈষৎ টোল। মঞ্জরীকে দেখিয়া ক্ষণেক তাঁহার কথা সরিল না।

মঞ্জরী পুনরায় বলিল, হুজুর!

চমক ভাঙিয়া বাবু কহিলেন, হ্যাঁ, এসো। শুনছ গো, ওসব চলবে না, পুলিনের সঙ্গেই ঘর করতে হবে।

শেষটা কহিলেন গোপিনীকে। কথার নির্দেশে মঞ্জরীর দৃষ্টি পড়িল ভয়ত্রস্তা গোপিনীর উপর, সে ত্বরিত পদে নিকটে গিয়া গোপিনীকে কাছে টানিয়া লইল।

আশ্বাস লোকে কথাতেও পায়, দৃষ্টিতেও পায়, স্পর্শেও পায়; গোপিনী মঞ্জরীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, রসকলি!

উজ্জ্বল হাসিতে মঞ্জরীর মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, ভয় কি রসকলি?

বাবু পুনরায় কহিলেন, বুঝলে, এই আমার হুকুম। উত্তর দাও, রাজী কি না? শুনছিস পুলিন?

পুলিন, গোপিনী উভয়েই নীরব। উত্তর দিল মঞ্জরী, তেমনই হাসিয়া, হুজুর, স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া কি ধমকে মেটে?

বাবু কহিলেন, আলবাত মিটবে, না মিটলে চলবে না।

মঞ্জরী বলিল, নাই যদি মেটে হুজুর, তাই বা কি? আমরা জাতে বোষ্টম, ছিঁড়লে মালা আমার নতুন গাঁথি।

বাবু কহিলেন, বেশ, তবে ও বলাকে পত্র করুক।

ওপাশে বসিয়া বলা মুচকি হাসিল।

গোপিনী প্রবল প্রতিবাদে বলিল, না না।

বাবু কহিলেন, তবে কী মতলব শুনি? কিন্তু আমার রাজ্যে ওসব বদমায়েশি চলবে না।

পুলিন কি একটা প্রতিবাদ করিল, কিন্তু এত ক্ষীণ যে কাহারও খেয়ালে আসিল না। সে নড়িয়া চড়িয়া বসিল, যেন ধৈর্য আর থাকে না। গর্তের সাপ ধরা পড়িবার পূর্বে যেমনতর বাহির হইতেও পারে না, অথচ ক্রোধে গর্তের ভিতরে কুণ্ডলী পাকাইয়া যেমন ঘোরে, তেমনই ভাবেই তাহার মনটা পাক খাইতেছিল।

মঞ্জরী কিন্তু বেশ সবিনয়ে সবল প্রতিবাদ করিল, জিভ কাটিয়া সে বলিল, ছি ছি, বাবু, আপনাকে ওসব কথা বলতে নাই।

বাবু অপ্রস্তুত হইয়া মঞ্জরীকে ধমক দিয়া কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তোমারও এখানে থাকা চলছে না, পাঁচজনে তোমার নামে পাঁচ কথা বলছে, তোমায় গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে।

মঞ্জরী সবিনয়ে বলিল, আজ্ঞে, কোথায় যাব ? মেয়েমানুষ আমি—

বাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আমার সঙ্গে চল তুমি, আমার বাড়িতে থাকবে।

মঞ্জরী বলিল, আজ্ঞে, ঝি-গিরি আমি করতে পারব না।

বাবু কহিলেন, আচ্ছা, কাজ তোমার করতে হবে না।

মঞ্জরী হাসিয়া বলিল, বাপরে ! রানীমা তা হলে ভাত দেবেন কেন ?

বাবু এবার বেশ রস দিয়া কহিলেন, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। আমাদের বাগানে তোমার কুঞ্জ করে দেব, এখানে যেমন আছ তেমনই থাকবে।—বলিয়া বাবু হাসিলেন, হাসিটি গেঁজলা রসের মতো, কেমন যেন বিশ্রী কুৎসিত গন্ধের আভাস দেয়।

মঞ্জরী কহিল, আমার পোড়ার মুখকে কী আর বলব !—সত্যি সত্যিই এ মুখে আগুন দিতে হয়। আপনি রাজা, আপনিও শেষ—। না হুজুর, আমি এ গাঁ ছেড়ে কোথাও যাব না, সে যে যা বলবে বলুক।

বাবু মেয়েটার স্পর্ধা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, সহসা তিনি উন্মত্তের মতো চীৎকার করিয়া কহিলেন, কেয়া হারামজাদী ? ভূতসিং, লাগাও জুতি হারামজাদীকো।

বদ্ধ লৌহদ্বার মত্ত হস্তীও ঠেলিয়া খুলিতে পারে না, আবার অর্গল খুলিলে আঘাতের অপেক্ষাও সয় না, খুলিয়া যায়। পুলিনের মনের দরজার ঠিক অর্গলটিতে হাত পড়িতেই সে খুলিয়া গেল, ভিতরের মানুষটি বাহিরে আসিল, সে একটা ভীষণ দাপে হাঁকিয়া উঠিল, খবরদার।

রাখাল পাইকের শিথিল মুষ্টির লাঠিগাছটা কাড়িয়া লইয়া মাটিতে ঠুকিয়া পুলিন বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটা গড়াইত কতদূর কে জানে, কিন্তু লোকে ব্যাপারটা গোটা বুঝিতে না বুঝিতে মঞ্জরী ত্বরিত পদে পুলিন ও গোপিনীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

স্তম্ভিত ভাবটা কাটিতেই বাবু কহিলেন, ভূতসিং !

বলা মৃদুকণ্ঠে কহিল, হুজুর, ওই মঞ্জরীর সঙ্গে গোকুলবাটীর থানার দারোগার পরিবারের সঙ্গে খুব সুখ, একটু বুঝে—

বলার কথাটা ঢাকিয়া দিয়া লাঠি হস্তে ভূতসিং ঘ্যানঘ্যান করিয়া বলিল, হজৌর, হুকুম !

বাবু কহিলেন, কুছ নেহি, যাও।

মঞ্জরী দুই জনের হাত ধরিয়া আসিয়া উঠিল একেবারে রামদাসের বাড়িতে। সারাটা পথ সে যেন সে কি ভাবনায় ভোর হইয়াছিল,—ভাবনা বলিলে ঠিক হয় না, সে যেন একটা আবেশ, একটা নেশা।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই মঞ্জরী দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, একগাছা মোটা লাঠি আনিয়া পুলিনের হাতে দিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বাইরে বোসো পাহারাওলা।

পুলিন লাঠি হাতে বাহিরে বসিল, আর ঘরের মেঝেতে বসিয়া নীরবে চোখের জল ফেলিতেছিল দুইটি নারী। গোপিনী নত দৃষ্টিতে, আর মঞ্জরী তাহার মুখের পানে চাহিয়া যেন নেশায় ভোর হইয়া বসিয়া ছিল।

সহসা হাসিয়া সে কহিল, রসকলি!

গোপিনী মুখ তুলিয়া হাসিল, বড় বিষাদের হাসি, যেন মলিন ফুলটি।

মঞ্জরী বলিল, এক কাছারি লোকের সামনে রসকলি পাতিয়েছ, 'না' বললে তো চলবে না।

গোপিনী কহিল, হ্যাঁ।

মঞ্জরী বলিল, তা ভাই, অনুষ্ঠানটা হয়ে যাক, তুমি আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও, আমি তোমার দিই,—যা নিয়ম তা তো করতে হবে।—বলিয়াই খুঁজিয়া পাতিয়া সব সরঞ্জাম বাহির করিয়া তিলক মাটি ঘষিতে বসিল।

তারপর গোপিনীর কোল ঘেঁসিয়া বসিয়া কহিল, তুমি ভাই আগে বলেছ, আগে তোমার পালা। দাও, আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও।—বলিয়া নিজের আঁকা রসকলিটি মুছিয়া ফেলিল।

হতভম্ব গোপিনী কম্পিত করে মঞ্জরীর নাকে রসকলি আঁকিয়া দিল।

মঞ্জরী বলিল, দাঁড়াও, সাক্ষী ডাকি।—বলিয়া বাহিরে পুলিনকে ডাকিল, সেই মধুভরা কণ্ঠে, রসকলি, এসো বলি।

পুলিনকে লইয়া গোপিনীর হাতে হাতে নিজের হস্তবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া কহিল, এই নাও রসকলি, আমার রসকলি তোমায় দিলাম।

পুলিনের কথা সরিল না।

তারপর পুলিনকে বলিল, আমি দিচ্ছি, 'না' বোলো না।

গোপিনী ও পুলিন বিস্মিত নির্বাক।

সহসা গোপিনী মঞ্জরীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, না না, তুমি শুদ্ধ এসো, আমরা দু বোনে—

রসোচ্ছলা রসোচ্ছলার মতোই কহিল, দূর, আমি যে রসকলি!

বৈকালের মুখে মঞ্জরী কহিল, দাঁড়াও, আমি একবার গাঁয়ের হালচাল দেখে আসি।

পুলিন বাধা দিয়া কহিল, সে কি, একলা ?

মঞ্জরী হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল, বলিল, ভয় কি ! আমার রসকলি যে সঙ্গে।—বলিয়া নাকের রসকলি দেখাইয়া দিল। তারপর আবার কহিল, ভয় নাই, আমি বাইরে বাইরে খবর নেব, তেমন তেমন বুঝলে আমি গোকুলবাটী থানায় যাব। আজ রাত্রে না ফিরতেও পারি, বুঝলে ? খবরদার, তোমরা বেরিও না, দিব্যি রইল, মাথা খাও।

সে কণ্ঠস্বরে পরিহাসের বিন্দুও ছিল না, পুলিন সে কথা অবহেলা করিতে পারিল না।

মঞ্জরী চলিয়া গেল, রাত্রে ফিরিল না।

পরদিন প্রাতে বলাই আসিয়া ডাকিল, মিতে !

মঞ্জরীর সংবাদের আশায় নিজের বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া দরজা খুলিয়া কহিল, এসো।

বলাই বলিল, বেশ বেশ, তা মঞ্জরীকে দিয়ে টাকাটা পাঠালি কেন ? নিজে গেলেই তো হত। তা ও বেশ ভালোই হল। বাবুও বললেন, বলাই, পুলিন যখন পঞ্চাশ টাকা জরিমানাই দিলে, তখন আর তার উপর রাগ নাই আমার। তা পুলিন বোধ হয় ভয়ে আসে নাই, তাই মঞ্জরীকে দিয়ে পাঠিয়েছে। মঞ্জরীকেও মাপ হয়ে গিয়েছে। তা একবার আজ যাস, বাবুকে পেন্নাম করে আসিস। ভয় নাই, আমিও সব বলে করে দিয়েছি।

পুলিনের কথা সরিল না।

জমিল না দেখিয়া বারকয়েক হুঁকা টানিয়া বলাই চলিয়া গেল। পুলিন স্তম্ভিতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। কে জানে—কতক্ষণ। একটি পুঁটলি কাঁখে মঞ্জরী আসিয়া হাসিমুখে অভ্যাসমতো হেলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, রসকলি !

পুলিন কথা কহিল না।

হাসিয়া মঞ্জরী বলিল, রসকলি, রাগ করেছ ?

পুলিন অভিমানভরে বলিল, তুমি জমিদারকে—

মঞ্জরী কহিল, জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বাদ করা কি চলে গো ? তাই মিটিয়ে ফেললাম।

পুলিন কহিল, টাকা—

মঞ্জরী কথা কাড়িয়া বলিল, সে তো তোমারই গো, আমি কি তোমার পর ?

তারপর পুলিনের হাত দুইটি ধরিয়া কহিল, তবে আসি।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো পুলিন বলিল, কোথায় ?

মঞ্জরী কহিল, বৃন্দাবন।

পুলিন অভিমান করিয়া বলিল, রসকলি !

মঞ্জরী কহিল, আমি তো তোমারই গো।

গোপিনী দ্বারের পিছনে ছিল, সম্মুখে আসিয়া যেন দাবি করিল, না যেতে পাবে না।

মঞ্জরী বলিল, তীর্থের সাজ খুলে কুকুর হব ?

গোপিনী কহিল, বল তবে, ফিরে আসবে ?

মঞ্জরী বলিল, আসব।

গোপিনী কহিল, আসবে ? দেখো।

উত্তর না দিয়া মঞ্জরী হাসিয়া পুঁটলিটি তুলিয়া লইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। বিচিত্র সে হাসি, রহস্যের মায়া-মাধুরীতে ভরা, কে জানে তার অর্থ !

চলিতে চলিতে গান ধরিল—

"লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো,
আমি গরবিনী।"

নাকে তাহার রসকলি, মুখে তাহার হাসি, চলনে সে কী হিল্লোল, রসধারা যেন সর্বাঙ্গ ছাপাইয়া ঝরিতেছিল।

সমাপ্ত

Collect More Books >
From Here